রবিউস সানি
১৪২৪
জুন-২০০৩

মাসিক

مجلة التحريض الشهرية الاسلامية

The Monthly At-Tahriz

আত্-তাহ্‌রীয

মজলুমদের সহযোগিতা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব

বর্তমান বিশ্বের সংকটময় মূহুর্তে আমাদের করণীয়

মুহাম্মাদ (সাঃ)-ই পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকারের প্রথম প্রবক্তা

আমরা আজ কোন পথে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মাসিক

আত্-তাহ্‌রীয

পৃষ্ঠপোষক

শাঈখ-নুরুদ্দীন হায়দার

উপদেষ্টা-মন্ডলী

মাওলানা আমিন উদ্দীন (শাঈখে কাতিয়া, সিলেট)

মাওলানা আব্দুল হক (পীর সাহেব,মাশিকাড়া,কুমিল্লা)

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

মাওলানা আবু ওমর

নির্বাহী সম্পাদক

এম.এ. সাঈদ

সম্পাদক

মাওলানা আব্দুল হালীম হুসাইনী

সহ-সম্পাদক

হাফেয মাওলানা আইয়ূবুর রহমান

বর্ষ ঃ ১ ॥ সংখ্যা ২

রবিউস সানী ১৪২৪

জৈষ্ঠ ১৪১০ বাংলা

জুন ২০০৩ ইসায়ী

শব্দ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স ডিজাইন

এস.এম.কম্পিউটার্স

আমিন বাজার, সাভার,ঢাকা।

মূল্য ঃ ১০ (দশ) টাকা মাত্র

যোগাযোগ

নির্বাহী সম্পাদক

মাসিক আত্-তাহ্‌রীয

শাহীন সুপার মার্কেট,

আমিন বাজার, সাভার, ঢাকা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়ঃ ----২
তাফসীরুল কুরআন ঃ ----৩
হাদীসে রাসূল (সাঃ) ঃ ----৪
সমকালীন প্রসঙ্গ ঃ
মজলুমদের সহোযোগিতা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব ----৫
মাওলানা মুহীউদ্দীন খান (সম্পাদক মাসিক মদীনা)
নির্বাচিত প্রবন্ধ ঃ
তাকাফুল –ইসলামী ইন্স্যুরেন্স---- ৭
মাওলানা মোঃ আলী আযম ফতেহ্‌পুরী
বর্তমান বিশ্বের সংকট ময় মূহুর্তে আমাদের করণীয়----৮
মোহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
আমরা আজ কোন পথে----১০
হোজাইফা বিন কাসেম
বিশেষ প্রবন্ধঃ
ইসলামী রাষ্ট্রপরিচালনায় মহানবী (সাঃ) আদর্শ----১২
সাখাওয়াত বিন তাহের
বিশেষ নিবন্ধ ঃ
তাকলীদ পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা----১৫
মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরিদী
মুহাম্মাদ (সাঃ)-ই পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকারের প্রবক্তা----১৭
উম্মে সালিম সালমা
দাওয়াত ও তাবলীগ ঃ
প্রথম দিনের সূর্য----২০
শফিউল্লাহ্ কোরাইশী
সমাজের বাঁকে বাঁকে ঃ
পরকীয়ার পরিণতি ----২১
আইয়ুব বিন তালিব
পেছন ফিরে দেখা ঃ
উপমহাদেশে মুসলিম শাসক মোগলদের স্থাপত্য----২৪
মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান
বাণী চিরন্তন ঃ ----২৬
নারী-অঙ্গন ঃ
নারী জীবনের দুই রূপ----২৭
শামসুন নাহার শিবলী
দূর দিগন্তে ঃ
তুমি চল কার ইশারায় ----৩০
রাবে আল হুসাইনী
পূণ্য জীবনে ধন্য যে জন ঃ
রক্তে লেখা নাম ----৩৩
আল মুফাক্কির
ইসলামী আইন ঃ
মাধক দ্রব্য গহণের অপরাধ ----৩৫
ধারাবাহিক উপন্যাস ঃ
ফুল শয্যা নয় ক্লাশিনকভ্ ----৩৭
দারাজ দিল
কবিতা মঞ্জুরী ঃ ---- ৩৯
কঁচি মনের ভাবনা ঃ ----৪০
এ মাসের শীর্ষ সংবাদ ঃ ----৪৩
আপনার জিজ্ঞাসা ও জবাব ঃ ---- ৪৫

সম্পাদকীয়

কাঁদছো?

কেন?

আমি করুণা করিনি? দেইনি অফুরন্ত বৈভব। সাগর-মহাসাগর। নদী-অরণ্যানী, শোভিত সীমাহীন প্রাকৃতিক সম্পদ। অপরিমিত তেল। তাহলে?

কাঁদছি!

বসরা, বাগদাদ, দজলা. ফোরাতের শ্যামল উর্বর অববাহিকায় ঢুকে পড়েছে রণোন্মাদ সৈন্য বাহিনী, লুট করছে, ধ্বংস করছে হাজার বছরের পুরানো ঐতিহ্য, দখল করেছে তেলখনি, ধ্বংস-স্তূপে পরিণত করেছে, হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হাহাকার আর আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে গেছে ইরাকের আকাশ-বাতাস। যেন আকাশটা ভেঙ্গে পড়েছে ইরাকে, নির্যাতিত মুসলিম বিশ্বে।মুসলিম উম্মাহ আজ কুফরী শক্তি বেষ্টিত, আরাকান, আফগান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, ইরাক। শুধু কি তাই? পৃথিবী আজ সংকুচিত, ক্রমাগত ধেয়ে আসছে বিপর্যয়, অপমান আর লাঞ্ছনার গ্লানি।

তাই কাঁদ্ছো ?

বলিনি--------

তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ্ তোমাদের হাতেই তাদের শাস্তি ও বে-ইজ্জতি নির্ধারিত রেখেছেন । আল্লাহ্তাআলা তাদের মোকাবেলায় তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরকে করবেন সুশীতল। (সুরা-তওবা, আয়াত-১৪)

তোমরা আল্লাহ্র রজ্জু ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা।" (সুরা-আলইমরান,আয়াত-১০৩) " আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহন করোনা।" (সুরা-মুহতামিম, আয়াত-১)

"ইয়াহুদী এবং মুশরিক তোমাদের উগ্রতম শত্রু।" (সূরা-মায়েদা, আয়াত-৮২)

" তোমরা শক্তির অধিকারী হও, প্রস্তুত রাখ বেগবান অশ্ব। আমার এবং তোমাদের জ্ঞাত-অজ্ঞাত দুশমনরা যাতে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।" (সূরা-আনফাল, আয়াত-৬০)

তারপরও?

তোমরা------

অনৈক্য, বেপরোয়া, ভোগ, বিলাস-ব্যসন, বিত্ত -বৈভব নিয়ে ব্যস্ত। কাফের মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব, তাওহীদি চেতনায় শিথিলতা, শিরক-বিদআতের প্রতি আকর্ষণ, জিহাদ ও শাহাদাত থেকে পশ্চাদপদ। তাজমহল আর আলহামরা তৈরীতে ব্যস্ত। কুরআনের সাথে করছো তামাশা, মোনাফেকী। রাসূল (সাঃ) কে আদর্শ বানিয়েছ শুধু দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, আতর, মেসওয়াক আর কাযলুলার ক্ষেত্রে। তাঁর চরিত্র, মহত্ব-হিম্মত,দৃঢ়তা, অটলতা, অবিচলতা, সহিষ্ণুতা, মানবতা, তাকওয়া, শিক্ষা, ইনসাফ, ন্যায়-নিষ্ঠা বীরত্ব সব ভুলে বসেছ। হাজার হাজার কাফের মুশরিকদের ডেকে নিয়ে এসেছো পবিত্র ভূমি জাজিরাতুল আরবে।

তা হবেনা কেন?

"তোমরা কুরআনের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ মানবেনা, এমন যদি হয় তাহল তোমাদের উপযুক্ত পুরুস্কার হল পার্থিব জিল্লতি ও লাঞ্ছনা এবং পারলৌলিক জীবনে প্রচন্ডতম শাস্তি।" (সূরা-বাকার,আয়াত-৮৫)

এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং তোমাদের কর্মের উপার্জিত ফসল।

স্মরণ কর!

তোমরা একসময় রোমান, পারস্য সাম্রাজ্যের নিরঙ্কুশ পতন ঘটিয়ে দুর্দান্ত দাপটের সাথে শাসন করেছিলে অর্ধ জাহান। একদিন নয়, দু'দিন নয়, একাধারে হাজার বছর।

তবু জাগবে না?

হ্যাঁ জাগবো।

তাহলে আসো, জাগো, কেঁদোনা, মুছে ফেল চোখের জল। ফিরে এসো কুরআনের কাছে। নববী আদর্শে আদর্শবান হও। ওমর, আলী, খালিদের (রাঃ আনহুম) আদর্শে উজ্জীবিত হও। প্রাসাদ ছেড়ে চলে এসো তাঁবুতে। গ্রহন কর যাযাবরের জীবন আর শুকনো রুটি ও একটি খেজুর।

নিশীথে নিভৃতে সেজ্দায় পড়ে কাঁদো, তওবা কর। অশ্ব নিয়ে ছুটো দূরদিগন্তে, শাহাদাতের তামান্নায়। হায়দারী হুঙ্কার ছাড়ো।

সংকটে-সংশয়ে, দুঃখে-দুঃসময়ে আল্লাহ্কে স্মরণ কর। তবেই কপাল ঠুকবে ওরা তোমাদের দ্বারে। পদতলে। তোমরাই হবে মহান স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তোমাদের জন্যেইতো হবে মহান প্রভূর এই বিশাল-বিস্তৃত যমীন্।

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بان لهم الجنة ط يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون قف وعلا عليه حقا فى التورية والانجيل والقران ط ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به ط وذلك هوالفوز العظيم ـ (توبه -١١١)

অর্থঃ আল্লাহ্ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। তাদের জন্য এর বিনিময়ে রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এই সম্পর্কে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছে সে সওদার জন্যে আনন্দ কর।

তারফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন– "আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের নিকট হতে তাদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে তারা শত্রুদেরকে হত্যা করবে এবং নিজেরা নিহত (শহীদ) হবে। এভাবে তারা আল্লাহর কাছে নিজেদের জান-মাল সমর্পণ করবে। বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে আখিরাতে মহা-সুখময় চিরস্থায়ী জান্নাতের মালিক বানাবেন। আল্লাহর এই প্রতিদান হচ্ছে– মুমিনদের প্রতি তাঁর বিপুল দান ও নেয়ামত। কারণ, তিনি নিজ সৃষ্টি–স্বীয় বান্দাদের নিকট হতে–ঈমান,ধন, পরিশ্রম, সাধনা ও আমল গ্রহণ করে উহার বিনিময়ে তাদেরকে অশেষ, বিপুল মহা নেয়ামত দান করবেন। এ কারণেই হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন– " আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় মুমিন বান্দাদের সহিত ক্রয়-চুক্তি সম্পাদন করেছেন এবং আল্লাহ্র কসম! উক্ত চুক্তিকে তিনি তাদের নিকট হতে গৃহীত পণ্যের বিনিময়ে তাদেরকে বিপুল, মূল্য প্রদান করার কথা ঘোষণা করেছেন। (অর্থাৎ- মুমিনদের ঈমান ও নেক আমল অতি মূল্যবান হলেও জান্নাতের নেয়ামত সমূহ এর তুলনায় অনেক অনেক মূল্যবান।)

শামাম ইবনে আতিয়্যা (রহঃ) বলেছেন– "প্রতিটি মুমিনের স্কন্ধেই আল্লাহ তাআলার সহিত সম্পাদিত একটি চুক্তি পালন করার দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। উক্ত চুক্তি সে পালন করুক অথবা না করুক– সর্বাবস্থায় তা পালনের দায়িত্ব কাঁধে রয়েছে।" শামাম ইবনে আতিয়্যা (রহঃ) তার কথার সমর্থনে এই আয়াত উল্লেখ করেছেন। কেহ কেহ বলেন– " কোন মুমিন যদি আল্লাহর পথে পরিচালিত জিহাদে প্রয়োজনীয় বাহন উট বা ঘোড়া (বোমারু বিমান, কপ্টার,ট্যাংক ইত্যাদি) প্রদান করে অথবা জিহাদের রসদপত্র (গোলা-বারুদ, বোমা, অত্যাধুনিক যাবতীয় সমরাস্ত্র) বহন করে তবে সে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত চুক্তির পালনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব ক্বরযী (রহ) প্রমূখ ব্যাক্তিগণ বলেন–" যে এক রাত্রিতে সর্বশ্রেষ্ঠ সেনানায়ক প্রিয় নবী (সাঃ) 'আকাবায়' মদিনার আনসারীদের নিকট থেকে বায়আত গ্রহন করেছিলেন সে রাত্রিতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) নবীজী (সাঃ) কে বলেন– " আপনি স্বীয় প্রতিপালক প্রভূর জন্যে এবং নিজের জন্যে আমাদের প্রতি যে যে শর্তারোপ করতে চান তা আরোপ করেন।" এতে প্রিয় নবী (সাঃ) বলেন– " আমি আমার প্রতিপালক প্রভূর জন্য তোমাদের প্রতি এই শর্ত আরোপ করছি যে, তোমরা তার ইবাদত করবে এবং অন্য কাউকে তার শরীক স্থির করবে না; আর আমি নিজের জন্য তোমাদের প্রতি এই শর্ত আরোপ করছি যে, নিজেদের জান-মাল কে যে সকল বিষয় হতে হেফাজত করে থাকো; আমাকে সে সব থেকে হেফজত করবে।" আনসারী সাহাবীগণ বলেন– আমরা তা করলে কি পুরুষ্কার পাবো? নবীজী (সাঃ) বলেন– ' জান্নাত'। তারা বলেন– এই বিক্রয় চুক্তিতো আমাদের জন্য বড় লাভজনক। আমরা তা ভঙ্গ করবনা আর তা বাতিল করতেও বলবনা। এরপর আল্লাহ মহান নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন– إن الله اشترى ..... الجنة ط يقاتلون.....

অর্থাৎ– " তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। জিহাদে তারা শত্রুকে হত্যা করুক এবং নিজেরা নিহত হোক–সর্বাবস্থায় তারা জান্নাত লাভ করবে।" (তাওবা-১১১) বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে নবীজী (সাঃ) বলেছেন– "যে ব্যাক্তি এই অবস্থায় আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে যে, জিহাদ এবং আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি ঈমান ছাড়া অন্য কিছু তাকে ঘর ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করে নাই– তার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা এই দায়িত্ব গ্রহন করেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।" অর্থাৎ উক্ত ওয়াদা আল্লাহ নিশ্চয় পালন করবেন। তিনি তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন এই সকল মহাগ্রন্থের প্রতিটি গ্রন্থেই উক্ত প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে জান্নাত প্রদান করার বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– আয়াতের উপরোক্ত অংশে বর্ণিত তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসমানী গ্রন্থে উহাকে উল্লেখ করেছেন।অর্থাৎ"আল্লাহ অপেক্ষা অধিকতর ওয়াদা পালনকারী কে আছে?' আরোবলেন–"

ومن اصدق من الله قيلا ـ

আর আল্লাহ অপেক্ষা অধিকতর সত্যবাদী কে আছে ? অর্থাৎ– যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত সম্পাদিত উক্ত বিক্রয় চুক্তিতে পূর্ণ করে , সে যেন মহাকৃতকার্যতা- জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহন করে। (সূরা-নিসা– ১২২)

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ألايمان بضع وُستون شعبة والحياء شعبة من ألايمان - بخارى ج ا

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুজুর (সাঃ) এরশাদ করেন, ঈমানের শাখা-প্রশাখা ষাট হতে অধিক, এবং লজ্জা–শরম ঈমানের অন্যতম শাখা। (বুখারী–১ম খন্ড)

ব্যাখ্যা ঃ অন্য এক হাদীসে ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তর হতে অধিক বলে উল্লেখিত আছে, কোন কোন হাদীসে সাতাত্তুরের প্রতিও ইঙ্গিত আছে। এক হাদীসে আছে, ঈমানের সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হলো ইহা স্বীকার করা যে- আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। সর্বাপেক্ষা ছোট শাখা-কষ্টদায়ক বস্তুকে চলাচলের পথ হতে অপসারিত করা। উল্লেখিত হাদীসে লজ্জা-শরম কে ঈমানের বিশেষ একটি শাখা বলা হয়েছে। কারণ- ঈমান যেমন মানুষকে কুকর্ম হতে বিরত রাখে, তদ্রুপ লজ্জা-শরমও মানুষকে অনেক কুকর্ম হতে বিরত রাখে।

লজ্জা-শরম মানব চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। দুর্বলতা ও পবিত্রতা এই দু'য়ের সংমিশ্রণে ঐ গুণটির উৎপত্তি। নিন্দিত হবার আশংকায় যে কোন কাজ করার বা কথা বলার প্রতি মানুষের মনে যে, একটা অনিচ্ছা ও সংকোচভাব এবং দূর্বলতা স্বভাবতঃ উদিত হয় তাকেই হায়া বা লজ্জা বলা হয়। প্রকার ভেদে লজ্জা কয়েক প্রকার। যথা ঃ ভালো কাজ করতে বা কোন ভালো কথা বলতে যদি শরম বোধ হয় ;তবে ইহা প্রকৃত পক্ষে শরম বা লজ্জা নয়। বরং ইহা এক প্রকার দূর্বলতা ব্যতীত কিছুই আর নয়। এরুপ শরমকে ঈমানের শাখা বলা হয় নাই। যেমন কোন দরকারি কথা আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করতে এই ভেবে যদি শরমবোধ হয় যে, এই সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করলে লোকে কি মনে করবে? বা কোন কামেল পীরের সহচর্যে থাকতে কেউ এই মনে করে লজ্জা বোধ করে যে লোকে তাকে বলবে সে মোল্লার তাবেদার হয়ে গিয়েছে কিংবা কোন গরীব অসমর্থ ব্যক্তির বোঝাটা মাথায় উঠিয়ে দিতে সাহায্য করলে তাকে সাহায্য করতে শরম বোধ হয় এই ভেবে যে, লোকে কি মনে করবে। এগুলোকে ঈমানের শাখা বলে প্রশংসা করা হয় নাই। বরং এগুলো এক প্রকারের অহংকার, হীনমন্যতা, নীচতা ও দূর্বলতা মাত্র। এই শরমকে হাদীসে এই ভাবে বলা হয়েছে যে, ইহা নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা মূলক কাজ করতে, পাপের কাজ করতে, প্রকাশ্যে পর পুরুষ ও পরস্ত্রীর সাথে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করতে বা কথা বার্তা বলতে ইত্যাদি কাজে সাহায্য করে । বস্তুতঃ এই পর্যায়ের শরমকে পকৃত প্রস্তাবে লজ্জা শরম বলা যেতে পারেনা। কারণ এসবের মধ্যে পবিত্রতার প্রাধান্য নেই।

এক হাদীছে আছে রাসুল (সাঃ) একদা ছাহাবী গণকে লক্ষ্য করে বললেন-" তোমারা আল্লাহ তাআলাকে পূর্ণ মাত্রায় লজ্জা কর।" ছাহাবীগন আরজ করলেন –" আমরা তো আল্লাহর তাআলা কে লজ্জা করে থাকি।" রাসুল (সাঃ) বললেন–" তোমারা সাধারণত যতটুকু লজ্জা করে থাক শুধু এটুকুই আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহকে পূর্ণমাত্রায় লজ্জা করে থাকে তার কর্তব্য স্বীয় মাথার মধ্যে যে সমস্ত শক্তি আছে, যথাঃ স্বরণ শক্তি, বিবেচনা শক্তি, চিন্তাশক্তি ইত্যাদি এবং তা সংলগ্ন ইন্দ্রিয় গুলো যথা-চক্ষু,কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ইত্যাদিকে কুকর্ম ও কুপথ থেকে বিরত রাখা। পেট এবং পেট সংলগ্ন রিপু (নফস ও গুপ্তাঙ্গ) কে তদ্রুপ রক্ষা করা (অর্থাৎ হারাম খাওয়া হতে বিরত থেকে মৃত্যু তথা এই অস্তিত্বকে বিলুপ্তি সাধন করতঃ আখেরাতের দিকে ধাবিত হওয়া)। দুনিয়ার মোহ ও ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি এই সমস্ত কাজ পুরাপুরি সাধন করবে সে-ই আল্লাহকে পূর্ণমাত্রায় লজ্জা করে বলে প্রমাণিত হবে।" (তিরমিযী শরীফ)

একজন মহা মনীষী লজ্জার ব্যাখ্যা এই ভাবে করেছেন যে , তোমার সর্বস্বের মালিক (আল্লাহতাআলা) যেন তোমাকে এমন জায়গায় এমন কাজে দেখতে না পান, যেখানে যেতে বা কিছু করতে তিনি নিষেধ করেছেন ইহাই প্রকৃত লজ্জা। এই সমস্ত বিবরণ অনুযায়ী স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে,কেউ প্রকৃত লজ্জা শরম অর্জন করতে পারলে সে শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হতে পারে। এই জন্য হায়া বা লজ্জা শরম কে ঈমানের একটি অন্যতম বিশিষ্ট শাখা বলা হয়েছে। আজ যদি মানুষের মধ্যে পুরাপুরি লজ্জা বোধ এসে যায় তাহলে অবশ্যই আমাদের সমাজে সংঘটিত নানা ধরনের অপকর্ম বিশৃংখলা অপসারিত হয়ে যাবে। আল্লাহপাক আমাদের কে এই হাদীছের উপর আমল করার তৌফিক দিন। আমিন।

মজলুমদের সহোযোগিতা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব

-মাওলানা মুহীউদ্দীন খান

ইঙ্গ-মার্কিন বর্গীদের হানাদারিত্বে মুসলিম -বিশ্বের হৃদপিন্ড ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। আল্লাহর নবী হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীব (আঃ), হযরত ইউনুছ (আঃ) প্রমুখ বহু নবী-রসূলের পূণ্য পদরেণুধন্য, পাকজমিন হযরত আলী (রাঃ), ইমাম হোসাইন (রাঃ) সহ হাজার হাজার সাহাবী, ইমাম আবু হানীফা আবু ইউসুফ, ইমাম মুহম্মদ, প্রমুখ অগণিত ইমাম অগণিত ইমাম মোহাদ্দিস ও বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী, জুনায়েদ বাগদাদীসহ হাজার হাজার ওলী আওলিয়ার বিচরণভূমি ইরাক আজ বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত। নব্য হালাকু ঘাতকদের পৈশাচিক উল্লাসে আজ ইরাকের প্রতিটি জনপদ এক ভয়াল বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। এ যুগের ফেরাউন নমরুদ বুশ ব্লেয়ার শ্যারনদের বিবেক বরতে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্ভবতঃ নেই । থাকলে অবশ্যই তাতে একটু না একটু নাড়া লক্ষ্য করা যেত!

দৃশ্যতঃ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বেশি তেল মজুদের দেশ ইরাকের যাবতীয় সম্পদ কুক্ষিগত করাই সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য হলেও বিশ্লেষকগণের মতে এই অভিযানের পশ্চাতে, ইহুদীদের আরও অনেক বড় লক্ষ্য রয়েছে। আর সেই রক্ষ্য অর্জন করার উদ্দেশ্য এরা অর্থ ও তেলের লোভ দেখিয়ে নমরুদ বুশ এবং খুনী ব্লেয়ারকে প্ররোচিত করেছে। হাদীস শরীফে এ মর্মে একটি বর্ণনা আছে যে, এক সময় ফুরাততীরের স্বর্ণের পাহাড়(তরল সোনা তেল?) দখল করার লক্ষ্য নিয়ে হায়েনার মত ঝাঁকে ঝাঁকে হানাদারদের আগমন ঘটবে।এদের [হানাদারদের (?)] শতকরা নিরানব্বই জনই এই হানাদারিত্বের খেসারত দিতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিবে! হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে হালাকুর নেতৃত্বের বর্বর মঙ্গোল বাহিনী যখন বাগদাদের উপর হামলে পড়েছিল, তখনকার দিনের অনেক আলেমই এরূপ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মঙ্গোলিওরাই সম্ভবতঃ হাদীস শরীফে উল্লেখিত সেই হানাদার বাহিনী! অনেকে আবার এদেরকে পবিত্র কোনআনে উল্লেখিত "ইয়াজুজ-মাজুজের" সাথেও তুলনা করেছিলেন। কিন্তু তখনকার দিনে যেহেতু ফুরাত নদীর তীরে তরল বা চাকা সোনার কোন ভান্ডারই দৃশ্যমান ছিল না, সে কারণে হাদীস শরীফে উল্লেখিত সেই ভয়ঙ্কর হানাদারদের আবির্ভাব ভবিষ্যতে কোন এক সময় ঘটবে বলে অধিকাংশ বিশ্লেষক অভিমত পোষণ করতেন। সাম্প্রতিক ফুরাত তীরে অবস্থিত তরল সোনার পাহাড় তেলক্ষেত্রগুলি দখল করার উগ্রনেশায় আগত এই হানাদার বাহিনীই কি সেই ঘাতক বাহিনী কি না, তাই বা কে বলবে? ইরাক শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে না ঘটবে এবং বর্তমান ঘটনা প্রবাহের শেষ পরিণতি কি হবে, এবং এ থেকেই তৃতীয়-বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হবে কিনা, এটা বিশ্বের তাবৎ শান্তিকামী মানুষের অবশ্যই কঠিন ভাবনার বিষয়। কিন্তু পাশাপাশি আরও একটা ভয়ঙ্কর ভাবনার বিষয় সামনে আসছে বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর জন্য। সেটা হচ্ছে, অভিশপ্ত ইহুদী-জাতির প্রায় দুহাজার বছরের লালিত স্বপ্ন বাইতুল মোকাদ্দাসে মসজিদুল আকসার ভিত্তির উপর তাদের কাঙ্ক্ষিত ধর্মমন্দির তাদের কাহেন বা ভবিষ্যত বক্তা ধর্মীয় তাত্ত্বিকগণের বক্তব্য অনুযায়ী এই মন্দির নির্মান এবং তাতে প্রবেশাধিকার লাভ করার জন্য তাদেরকে শাপমুক্ত হতে হবে। এই শাপমুক্তির জন্য তওরাতের ভাষ্য তালমূদ কিতাবে একটি নিখুঁত লালবর্ণের গাভী সংগ্রহ করে বিশেষ এক যজ্ঞের মাধ্যমে সেটি কোরবানী দিতে হবে। ওদের কাহেনদের ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী দুহাজার বছরের অভিশপ্ত জীবন যাপন করার পর এখনই সম্ভবতঃ সেই শাপমুক্তির মুহূর্তটি সমাগত! পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের ভাষ্য অনুযায়ী কট্টরপন্থী ইহুদীরা ইতোমধ্যেই প্রত্যাশিত সেই নিখুঁত লাল গাভীটি আমেরিকার ফ্রিডেলফিয়া অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে এবং পরম যত্নে সেটিকে ইসরাঈলের রাজধানী তেলআবীবে স্থানান্তরিত করা হয়েছে! সুতরাং বর্তমান যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেই যদি আকস্মিক কোন অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস ধ্বংস করে তৎস্থলে ওরা পরিকল্পিত মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয় তবে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু থাকবে না! ইয়াহুদী ধর্মগ্রন্থের ইঙ্গিত অনুযায়ী একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই ওদের সেই প্রতীক্ষিত সময়টির আগমন ঘটতে পারে। এ ব্যাপারে গোঁড়া ইয়াহুদীরা এতই সুনিশ্চিত যে, বিগত শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে ভারতের বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে তৎস্থলে রামমন্দির নির্মাণের ব্যাপারে ওরা অর্থ ও সব ধরনের কারিগরি সমর্থন জুগিয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল দু'টি প্রথমঃ মসজিদুল আকসা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসী চরিত্রের দক্ষ মজুদুর সংগ্রহ। কেননা, ইয়াহুদী বা খৃস্ট ধর্মাবলম্বী কোন মজদুর মসজিদুল আকসা ধ্বংশ করার কাজে হাত লাগাতে সম্মত নাও হতে পারে! কারণ ওরাও মসজিদুল আকসার মর্যদা ও পবিত্রতা সম্পর্কে জ্ঞাত। এজন্য ইয়াহুদীরা কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদী পশু চরিত্রের ভারতীয় মজদুর সংগ্রহ ও ওদের দ্বারা বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে পবিত্র মসজিদে আকসা ধ্বংস করার একটি মহড়া অনুষ্ঠান করেছে। দ্বিতীয়তঃ মসজিদুল আকসা ধ্বংস করার প্রতিক্রিয়া মুসলিম উম্মাহর কতটুক কি হয় তারও একটি পরিমাপ করে নিয়েছে ওরা সেই ঐতিহাসিক মসজিদটি ধ্বংস করার মাধ্যমে। বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার পর খোদ ভারতের অসহায় মজলুম মুসলমানরা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু মুসলিম শাসিত দেশগুলি বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যে এর কোন প্রতিক্রিয়াই দুনিয়ার মানুষ দেখেতো নাই বরং কোন কোন আরব দেশে প্রবাসী শ্রমজীবী মানুষ

প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমে আসলে তাদের উপর নিতান্ত নির্মম দমন-পীড়ন চালানো হয় । ঐ ব্যারোমিটার দিয়েই ইয়াহুদী শয়তানেরা মসজিদুল -আকসা ধ্বংস করে দেওয়ার পর মুসলিম দেশগুলিতে এর প্রতিক্রিয়া হতে পারে বা মুসলিম রাষ্ট্রগুলি কতটুকু অগ্রসর হতে পারে তা আন্দাজ করে নিয়েছে। ইয়াহুদী দুর্বৃত্তদের দুঃসাহস শুধু মসজিদুল-আকসা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে মনে হচ্ছেনা।

অতঃপর এরা মদীনা মোনাওরাকেও লক্ষ্যস্থলে পরিণত করার চেষ্টা করতে পারে। ১৯২০ খৃস্টাব্দে প্রণীত বিশ্ব জায়েনবাদের প্রটোকল মদীনা মোনাওয়াকেও ওদের পরিকল্পিত বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্রের অন্তর্ভক্ত দেখানো হয়েছে। অপরদিকে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিভূ শিবসেনা নামক কট্টরপন্থী সন্ত্রাসীরা পবিত্র কাবাকে ওদের উপাস্য ব্রহ্মার আদি মন্দিররূপে অভিহিত করে সে মন্দির উদ্ধারের সংকল্প বারবার ব্যক্ত করেছে। ভারতের একটি উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্য অনুযায়ী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাদের সন্ত্রাসী ক্যাডারদের মুসলিম নামের পাসপোর্ট দিয়ে মুসলিম মজদুর সাজিয়ে পবিত্র মক্কা-মদীনা এবং জেদ্দা ও আশে পাশের এলাকায় পাঠিয়ে ওদের মাধ্যমেই যে কোন ঝুকিপূর্ণ দুঃসময়ে মুসলিম উম্মাহর আত্মা-সদৃশ পবিত্র মক্কা-মদীনায় হাঙ্গামা সৃষ্টি করে দেওয়ার অপচেষ্ট চালাতে পারে!

মোটকথা, বর্তমান ইরাক যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে আমাদের তিন পবিত্র মসজিদের উপর ইয়াহুদী শয়তানদের আগ্রাসন শুরু হয়ে যেতে পারে। ইয়াহুদী দুর্বৃত্তচক্র ভারতের সাম্প্রদায়িক দানবদের সাথেও আঁতাত করেছে, তা মুসলিম উম্মাহর জন্য ভয়ঙ্কর কোন দূর্দিনের সৃষ্টি করে দিতে পারে । এই ভয়বহ পরিস্থতিতে মুসলিম উম্মাহর করণীয় কি, সংকট উত্তরণের লক্ষে তারা কোন পথ অবলম্বন করতে পারে, এ বিষয়গুলি অবশ্যই সব অঞ্চলের ইসলামী নেতৃত্বকে ভেবে দেখতে হবে। খ্রিস্টীয় বিগত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কট্টরপন্থী ইয়াহুদী-নাসারদের সম্মিলত চেষ্টায় ইসলামী খেলাফত উৎখাত করা হয়। খেলাফত উৎখাতের লক্ষ্যই ছিল রানৈতিকভাবে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধকরে দেওয়া।বিশেষতঃ আরব জাহানকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরব ভূখন্ডকে ব্যবহার করে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীচক্র ইরাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ লাভ করেছে, তখন স্বভাবতঃই মনে পড়ে খেলাফত পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় রত ইসলামী নেতৃবৃন্দের সতর্কবাণীগুলির কথা। তখনকার সময়ে বৃটিশ ইয়াহুদী গুপ্তচর লরেন্সদেরকে আরবী পোষাক পরিধান করে মরুদ্যান থেকে মরুদ্যানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। এখন প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে। এখন অতীতের শরীফ হোসইনরা ইসলামী পোষাক পরেই ইয়াহুদী ইয়াহুদী-নাসারাতের সাথে একাকার হয়ে গিয়েছে। তখনকার বিশ্বমুসলিম নেতৃবৃন্দ হতাশাগ্রস্থ লুণ্ঠিত ইসলামী জনতাকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের ভবিষ্যত রচনা করার লক্ষ্যে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বর্তমানে সউদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা মহান আব্দুল আজীজ ইবনে আব্দুর রহমান তখনকার মুসলিম উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদগণকে পবিত্র কাবার সম্মুখে (১৯২৬ খৃ) একত্রি করে অস্তিত্ব রক্ষার দাগিদেই একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করার তাগিদ দিয়েছিলেন।বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বিজ্ঞ আলেম সমাজ তখন খন্ডে খন্ডে বিচ্ছিন্ন মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রগুলিকে পাশ কাটিয়ে জনগণ পর্যায়ে একটি ঐক্যের ভিত তৈরী করার কর্মপন্থা স্থির করেছিলেন। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ধ্বংসস্তুপ থেকে পুনরুত্থানের একটি পথ সে প্রচেষ্টার মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল! আজকের দিনেও মহান আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুর রহমানের উত্তরসূরিগণ কিংবা মুসলিম বিশ্বের অন্য যে কোন একটি দেশের অন্ততঃ একজন রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানও যদি জনগণ পর্যায়ে আত্ম রক্ষার কোন পন্থা উদ্ভাবন করতে সচেষ্ট হন এবং নেতৃত্ব প্রদান করতে এগিয়ে আসেন তবে বিরাজমান সংকট থেকে মুসলিম উম্মাহর উত্তরণ মোটেও কঠিন কিছু হবেনা ।

আজ দুনিয়ার প্রতিটি মুসলিম শিশুও একথা বুঝতে পারছে যে, ভয়ঙ্কর এক বিপদ তাদের সম্মুখে উপস্থিত । যুদ্ধের বিভীষিকাময় ধ্বংসলীলার দৃশ্য, আরব মুসলিম শিশু ও নারীর লাঞ্চনা বিগম্বনা প্রতি মুহূর্তে টেলিভিশনের পর্দায় সবাই দেখতে পাচ্ছে !এমতাবস্থায় যার অন্তরে ঈমানের সামন্যতম একটু রিশ্মি বিদ্যমান তেমন কারো পক্ষে নিজেকে সামলে রাখা সম্ভব নয়। আফগানিস্তানেও তারা এই দৃশ্যই দেখেছে। সতরাং আফগানিস্তানে ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করার অজুহাত দাঁড় করিয়ে যে অন্যায় গণহত্যা কর হয়েছে তার প্রতিক্রিয়ায় মজলুম শহীদানের প্রতিটি রক্ত বিন্দূ থেকে যেমন আরও অগণিত ওসামার জন্ম হয়েছে, তেমনি সাদ্দামকে সপরিবারে হত্যা করার অভিলাষে বাদাদা অভিযান থেকে আরও হবু সাদ্দামের জন্ম হবে আর ভুমির প্রতিটি জনপদে। তৎসঙ্গে যদি এই যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে ইয়াহুদী পিশাচেরা মসজিদুল-আকসা বা মদীনা মোনাওয়ারায় কোন ইবলিসী দুঃসাহস দেখায় তবে হাদীস শরীফে উল্লেখিত সেই 'মাহামাতুল-কোবরার' ই সূচনা হবে! ফুরাত তীরের সোনার পাহাড় কুক্ষিগত করার লোভে আগত হানাদরদের শতকরা নিরানব্বইটির কবর রচিত হবে মরুভূমিগুলিতে! আল্লাহই ভাল জানেন এই অন্যায় যুদ্ধের পরিণতি কি হবে, আর এইটিই সেই মহাযুদ্ধের সূচনা কিনা? তবে মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের বিবেকে যদি এই যুদ্ধ সামান্য একটু নাড়াও সৃষ্টি করতে পারে, তবে যে ক্ষয় ক্ষতি ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে, তা খুব বড় ক্ষতি রূপে বিবেচিত নাও হতে পারে! ইরাক কারবালার স্মৃতিবিজড়িত দেশ। হালাকুর মঙ্গোল বাহিনীর গণহত্যা হজম করে পুনরায় জেগে ওঠা দেশ। স্মরণীয় যে, ইসলাম নব জীবন লাভ করে প্রতিটি কারবালার পরই! এবারও শোকের মাস মুহররমে আপতিত নব্য ফেরাউন-নমরুদের হামলা বরদাশত করে পুনরায় নব-উদ্দীপনায় জেগে উঠবার তওফীক আল্লাহপাক ইরাকবাসীকে অবশ্যই দিবেন। আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে! আমাদের এবার ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করার পালা! এই মহাসংকট কালে আমরা যেমন মহান সৃষ্টিকর্তার রহমত কামনা করে সর্বক্ষণ প্রার্থানার হাত প্রসারিত করে রাখব, তেমনি স্ব স্ব সাধ্য অনুযায়ী জালেমদের বিষদাঁত ভেঙ্গে মজলুমের সহোযোগিতায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখা কর্তব্য! নাসরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারীব! ওয়া বাশশিরিল মু'মেনীন।

নির্বাচিত প্রবন্ধ

তাকাফুল-ইসলামী ইন্স্যুরেন্স

মাওলানা মোঃ আলী আযম ফতেহ্‌পুরী

ইংরেজী 'Insurance' শব্দের নিকটতম আরবী প্রতিশব্দ হলো তাকাফুল । একটি গ্রুপ বা দলের সদস্যরা একে অপরকে সাহায্য করার অথবা পারস্পারিক জিম্মাদারী নেওয়া কাজকে আরবীতে তাকাফুল বলা হয়। পারস্পারিক সাহায্য চুক্তি যেমন শত্রুর বিরুদ্ধে হতে পারে তেমনি দৈব-দুর্বিপাক, দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা থেকে পরিত্রানের ক্ষেত্রেও হতে পারে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী পাশ্চাত্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী থেকে ভিন্নতর। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়ে প্রচলিত পদ্ধতির ইন্স্যুরেন্স না থাকলেও ইন্স্যুরেন্স জাতীয় ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। একবার রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জানতে পারলেন যে, একজন আরব বণিক স্বর্বশান্ত হয়ে গেছেন। তার বাণিজ্য তরী সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে সকল বানিজ্য -দ্রব্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে সবকিছু হারিয়ে বহু কষ্টে জীবন রক্ষা করে বণিক তীরে এসে পৌছেছেন। তার এ দূর্ভোগ সকলের হৃদয় স্পর্শ করলো। সাহাবীরা বণিকের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও সহানুভূতি প্রকাশ করলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদেরকে বললেন, সাধ্যমত দান করে বণিকের ক্ষতি কিছুটা পূরণ করে দেওয়ার জন্য। এতে পারস্পারিক সহানুভূতির মাধ্যমে বেশ কিছুটা আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হল। সেদিনের সেই সাহায্যের পদ্ধতিটিই বর্তমান সময়ের পরিভাষায় সামুদ্রিক বীমা।

একটি ইসলামী সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ ধর্মীয় অনুভূতির অংশ। পরকালীন সফলতা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একজন অপরজনকে সাহায্য করে। সুদী ইন্সুরেন্স পদ্ধতিতে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের সঠিক চেতনা ও অনুভূতি নেই। ব্যক্তিগত ইন্স্যুরেন্স পলিসি হোল্ডাররা একজন অপরজনকে চিনেন না। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এত বিরাট যে বিপুল সংখ্যক সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক পরিচিতি সম্ভব নয়। বিপদের সময় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী হতে ক্ষতিপূরণ কিছুটা পাওয়া যায়। সে কারণেই গ্রাহকগণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর সদস্য হন।
বীমা শিল্পকে ইসলাম সম্মত করতে হলে সদস্যদের মধ্যে আদর্শিক ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করে সমবায়ী চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। সুদের পরিণতি সম্পর্কেও তাদেরকে বুঝানো দরকার। আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করছেন। সুদ অতি জঘন্য পাপ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সুদের ৭৩ টি স্তর রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন অপরাধের পরিমাণ হল মায়ের সাথে জেনার (ব্যভিচার) লিপ্ত হওয়ার সমান। (ইবনে মাজাহ,বায়হাকী ইত্যাদি) সুদ বিহীন ব্যাংক একসময় অকল্পনীয় ছিল। অথচ বর্তমান বিশ্ব ব্যাংকের দৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ দেশের সফলতম ব্যাংক। সারা বিশ্বে তিন শতেরও বেশী ইসলামী ব্যাংক সফলভাবে চলছে।

আমাদের দেশে দুই হাজার ঈসায়ী সাল থেকে জেনারেল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এবং ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানীর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পাকিস্তান এবং ভারতে কোন ইসলামী ইন্স্যুরেন্স স্থাপিত হয়নি। তাই উপমহাদেশ এগুলোই সর্বপ্রথম ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী। তবে পৃথিবীর বহু দেশে এমনকি পাশ্চাত্য দেশ সমূহেও ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর সফলতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে।

একটি ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর সাফল্য নির্ভর করে মূলতঃ কোম্পানীর সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা এবং কর্মকর্তাদের ইসলামী ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে জ্ঞান, সুস্পষ্ট ধারণা, উৎসাহ আনুগত্য এবং একে ইবাদাত হিসেবে গ্রহন করার মানসিকতা সম্পন্ন হওয়ার উপর।

শরীয়াহ কাউন্সিলের মাধ্যমে ইসলামী বীমা সম্পর্ক আগ্রহী চিন্তাবিদ আলেম, ফকীহদেরকে সম্পৃক্ত করা হলে ইসলামী ব্যাংকিং এর ন্যায় গ্রহনযোগ্য শরীয়ত সম্মত ইসলামী ইন্সুরেন্স ব্যবস্থা এদেশেও গড়ে তোলা সম্ভব।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, সৎ ব্যবসায়ীদের হাশর হবে আম্বিয়া, শুহাদা, সিদ্দিকীন এবং সলেহীনদের সঙ্গে।" তাই ব্যবসাকে নিছক রুটি রোজগারের মাধ্যম না বানিয়ে এই মহৎ পেশাকে জনসেবা তথা ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করে মহান আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর রেজামন্দি অর্জনের তৌফিক আমাদের সকলকে দান করুন । (আমীন)

নির্বাচিত প্রবন্ধ

বর্তমান বিশ্বের সংকটময় মুহূর্তে আমাদের করণীয়

মোহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম

পবিত্র ইসলাম ধর্মের সূচনালগ্ন থেকেই ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক সহ তামাম অমুসলিম সম্প্রদায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শান্তিপ্রিয়, নিরহ মুসলমানদের শান্তির আবাসকে ও খোদায়ী বিধান যাতে দুনিয়াতে কায়েম না হয়। ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের এ ষড়যন্ত্র কোন দিনই থেমে থাকেনি।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আবির্ভাব হওয়া এবং তাঁর ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রারম্ভেই ইয়াহুদী, খৃস্টান ও মুনাফিক চক্র সক্রিয়ভাবে নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। তারা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে দুনিয়া হতে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার ভয়ংকর পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর হাবীবকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য। বিধায় মহান রাব্বুল আলামিন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) কে তাঁর স্বীয় কুদরতে এলাহির অফুরন্ত ক্ষমতাবলে হিফাজত করেছেন। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) অত্যন্ত পরিশ্রম ও সাধনা করে মহান রাব্বুল আলামিনের বিধান দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি এমন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সংগঠন পৃথিবীর বুকে শান্তির আবাস প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে দিয়ে ছিলেন যে, শান্তি একমাত্র নিহিত রয়েছে এক আল্লাহহর বিধান কায়েমের মধ্যেই।

উক্ত সংগঠনের যাঁরা কর্মী ছিলেন তাঁরা ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী ,সুশিক্ষিত, মার্জিত, বিনয়ী সহমর্মিতা সম্পন্ন ,পরস্পর পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ, তাদের মাঝে ছিলনা কোন দ্বন্দ্ব হিংসা, বিদ্বেষ পরশ্রিকাতরতা ঝগড়া-ফাসাদ ও কলহ। একই পতাকাতলে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়।

কিন্তু বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা কোন স্থানে বা দেশে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে পারছেনা। কোন দেশের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি হলে বা ইসলামী জীবন বিধান কায়েম করার আগ্রহ দেখালে তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। মুনাফিকরা বর্তমানে তামাম দুনিয়ার মানুষকে এ বলে ধোঁকা দিচ্ছে যে, তারা নাকি এ দুনিয়াতে শান্তির আবাস গড়বে। তাই তারা সন্ত্রাস নামক ব্যাধিকে দুনিয়া হতে উৎখাত করার নাম করে মুসলিম প্রধান দেশকে হামলার নিশানা বানিয়ে এখনই মোক্ষম সুযোগ মনে করে একের পর এক মুসলিম দেশসমূহকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এরা এতটা পাষাণ ও নিকৃষ্ট মানসিকতার যে, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় নির্বিচারে নিরিহ নারী-পুরুষ শিশুকে হত্যা করে। ইতোমধ্যেই এই কাপালিক সাম্রাজ্যবাদীরা আফগানিস্তানের ইসলামী সরকারকে ধ্বংস করে সেখানে তাদের অনুগত মীরজাফর, মুসলমান নামের কলঙ্ক কারজাই সরকারকে ক্ষমতার মসনদে বসিয়েছে। কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, বার্মাসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই মুসলমানরা আজ গ্লানিকর পরাধীনতায় ভুগছে । এমনকি আমাদের সোনার বাংলাদেশে মুসলমানরা ধর্মীয়ভাবে নিজ দেশে পরবাসী।

এখানে মুসলমানরা সমস্ত জনগোষ্ঠির শতকরা নব্বই ভাগ। পৃথিবীর মানচিত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে পরিচিত। তারপরেও যদি বলি আমাদের দেশে আমরা খোদায়ী বিধান কায়েম করব তা হলে আর পালাবার জায়গা কোথায়। চারিদিক থেকে আসবে জুলুম আর নির্যাতন। যেন কোন মহা অপরাধী। যদি জুলুমে ক্ষান্ত না হয় তবে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলায় ঝুলতে হবে,পঁচতে হবে কারাগারের অন্ধকারে। মুসলমানদের দেশে মুসলমানদের উপর এ জুলুম হয় কার ইশারায় ভাববার বিষয় নয় কি? এর হেতুটা কি? নিশ্চয় এর মধ্যে এক বিরাট রহস্য লুকায়িত আছে।

আমরা যদি ইসলাম ধর্মের গোড়ার দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাই যে ঐ সময়ও কাফের মুশরিক ও মুনাফিকরা একতা বদ্ধভাবে প্রিয়নবী (সাঃ) ও মুসলমানদের বিরূদ্ধে ভয়ংকর ষড়যন্ত্র করেছিলে। কিন্তু প্রিয়নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগন (রাঃ আনহুম) সবাই মিলে মহান আল্লাহর উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও একতাবদ্ধতার মাধ্যমে সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিল। মোকাবেলা করে ছিল সকল বাধা বিপত্তির। কিন্তু আজ আমরা কেন এই ইয়াহুদী ,খ্রিস্টান, মুনাফিকদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে তার সকল পরিকল্পনা পারছিনা নস্যাৎ করে দিতে? যদি গভীরভাবে চিন্তা করি এর কারণ হিসেবে মিলবে আজ আমরা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অনেক দূরে। আমরা আমাদের সঠিক পথ হতে বিচ্যুত। আমাদের ঈমান ,আমল, ইবাদত-বন্দেগী ও কাজ-কারবারে নেই কোন খুলুছিয়ত। আমরা সবকিছুতেই যেনো আজ মহান স্রষ্টার বিধানকে পেছনে রেখে গায়রুল্লাহর উপাসনাকে প্রধান্য দিচ্ছি। দেব-

দেবীর মূর্তি পূজারীদের মতো মাজারপূজা, পীরপূজা শিরকের মধ্যে লিপ্ত। আজ আমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে সাধারণ বিষয় নিয়ে হানাহানিতে লিপ্ত। আর এ সুযোগে অমুসলিম ও মুনাফিকরা মুসলমানদের মধ্যে নানা মতভেদ সৃষ্টি করে তাদের ফায়দা লুটছে। সেই সাথে মুসলমানদের শক্তিকে নস্যাৎ করছে। অথচ মুসলিম জাতিতো এমন ছিলনা এমন হওয়াও উচিৎ ছিলনা । হাদীসে উল্লেখ আছে -পৃথিবীর সকল মুসলিম একে অপরের ভাই এবং পৃথিবীর কোন একপ্রান্তে যদি কোন মুসলমান দেহে আঘাত প্রাপ্ত হন তাহলে সেই আঘাতের অনুভূতি যেনো পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের হৃদয়ে জাগরিত হয়। বাস্তবে আজ তা কোথায়? কোথায় সেই একতার বন্ধন, সেই অনুভূতি? আফগান, ইরাক, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন ও বার্মার এবং গুজরাটের মুসলমানদেরকে যেভাবে নির্মম জুলুম আর নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হচ্ছে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া তো আমাদের মাঝে জাগরিত হচ্ছেনা। আমরাতো আজও একতাবদ্ধ হতে পারলামনা । অথচ মুসলমানদের এই দুঃসময়ে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন একতাবদ্ধ হওয়া। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাড়াবাড়ি না করে একতাবদ্ধভাবে কাজ করে যাওয়া। এ সম্পর্কে কুরআনে পাকে মহান রাব্বুল আলামিন পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করছেন–" তোমরা আমার বিধানকে মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে ধরো এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে দূরে থাকো। " অন্য এক আয়াতে কারীমায় এরশাদ হচ্ছে– "কাফের মুশরিকদের সাথে তোমরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করোনা।" কিন্তু আজ আমরা কি করছি? আল্লাহ পাকের সেই আদেশকে কি ভাবে মূল্যায়ন করছি। আল্লাহ পাকের বিধান ও রাসূল (সাঃ) মতাদর্শকে বাদ দিয়ে বিজাতীয় মতাদর্শ আর তাদের সভ্যতার নামে অসভ্যতাকে গ্রহণ করছি । তাদের সংস্কৃতি কৃষ্টিকালচারে হাবুডুবু খাচ্ছি তার মাঝেই খুঁজছি শান্তি। কিন্তু শান্তিতো আমাদের ভাগ্যে জুটছেইনা পক্ষান্তরে মিলছে আল্লাহর গজব আর আযাব। এই মহা সংকট হতে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহ পাকের বিধানকে দুনিয়ার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে কায়েম করা। আর সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বিধান এবং রাসূলের আদর্শ বাস্তবায়ন করা। আর তার আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য চাই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। চাই একজন খোদাভীরু,সৎ ও যোগ্য আমানতদার , সাহসী , নির্ভীক নেতার। যে হবে সত্যের ব্যাপারে কোমল আর মিথ্যার ব্যাপারে হবে পাথরসম কঠিন। কিন্তু আমাদের দেশে না আছে এমন কোন বলিষ্ঠ কর্মসূচী বা সংগঠন যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর যমীনে একমাত্র তাঁরই বিধান কায়েম হতে পারে। অথচ এদেশের মুসলমানদরা খোদাভীরু বা পরহেজগার কম নয় তা সত্ত্বেও শুধু অনৈক্যের কারণে মুনাফিকরা তাদের কুৎসিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলছে।

পক্ষান্তরে আমরা থাকছি পিছিয়ে। মুসলমানরা আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহর বিধানের কথা উঠালেই হয় তালেবান, সন্ত্রাসী, জঙ্গী আরোও কতকিছু। তাই মুসলমান হিসেবে যে দলই ক্ষমতায় থাক তাদেরই উচিৎ হবে মুসলমানদের ধর্মীয় পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া। কুরআনের বিধান কায়েম করার ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগ দেয়া । এ কাজটা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে অত সহজ নয় কারণ পেছনে থাকছে মহাশক্তির দাবিদার দাদাবাবুরা । তাদের সমর্থন ছাড়া এ কাজ করা খুবই কষ্টসাধ্য হবে। তবে যদি আমাদের এ বিশ্বাস অন্তরে থাকে যে রুটি রুজির মালিক আল্লাহ নিজেই কোন দেশ বা কোন দাদাবাবুদের হাতে ন্যস্ত করেনি । তাহলে যে কোন ক্ষমতাসিন রাজনৈতিক দলের কুরআনের বিধান কায়েম করা ইচ্ছার ব্যাপারমাত্র। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত নেয়া কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে আদৌ কি সম্ভব হবে না? হয়তো তাই। তাহলে আমাদের হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকার সময় নেই তাহলে জবাব দেয়ার কোন ভাষা আমাদের থাকবেনা।

তাই আমাদের করণীয় হবে সকল মুসলমানদেরকে একতাবদ্ধ করা তাদেরকে সঠিক দ্বীনের বুঝ দান করার মাধ্যমে কুরআনি বিধান কায়েমের পথ সুগম করা। সকল মতানৈক্য আর দলাদলির অবসান ঘটিয়ে রাসূল (সাঃ) এর দেখানো তরিকা অনুয়ায়ী কাজ করা। যেখানে কুরআনের স্পষ্ট বিধান আছে সেখানে নিজেদের জ্ঞান-বিবেক খাটানোর কি প্রয়োজন আছে। আসুন তাই কোন যুক্তি তর্ক না করে শুধু আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য তাঁর হাবীব কতৃক দেখানো পথ ও মতে এগুতে থাকি দেখব অচিরেই এদেশের আকাশে উড়বে কলেমার পতাকা। শান্তির অমিয়ধারা বয়ে যাবে দেশের আনাচে-কানাচে। থাকবেনা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ। কেউ খেয়ে কেউ নাখেয়ে থাকবেনা। থাকবেনা কোন জুলুম-শোষণ।

-----♠♠♠-----

নির্বাচিত প্রবন্ধ

আমরা আজ কোন পথে?

হোজাইফা বিন্ কাসেম

আল্লাহর রাসূল প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর দায়িত্ব পালন করে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। চলে যাওয়ার প্রাক্কালে আরাফার ময়দানে বিদায় হজ্বের ভাষণে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, আমি কি পরিপূর্ণভাবে দ্বীন তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি? এই কথা বার বার উচ্চারণ করে তিনি উপস্থিত সকলের সাক্ষ্য গ্রহন করেছিলেন। সেদিন সকলে একবাক্যে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আপনি দ্বীনের সবকিছুই আমাদের নিকট পৌছিয়েছেন।

রাসূল (সাঃ) দ্বীনের জন্য শরীরের রক্ত ঝরিয়েছেন। দন্ত মোবারক শহীদ করেছেন। কিন্তু রাসূল (সাঃ) সেই রক্ত ঝরা ইসলামের অবস্থা কি? তাঁর অনুসারী ও উম্মতের অবস্থা কি? আজ হুজুরে পাকের দাঁত মোবারক শহীদ করা দ্বীন কাফের মুশরিকর ও ইয়াহুদীদের দ্বারা পদদলিত হচ্ছে। কুরআন কে ডাস্টবিনে ফেলা হচ্ছে। হুজুর (সাঃ) কে চরিত্রহীন বলে (নাউজুবিল্লাহ) গালী দেয়া হচ্ছে। এতকিছুর পরও উম্মতে মুহাম্মাদিরা গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত। আজ তারা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ফরজ গুলো মেনে চলছে না। শতকরা দশজন মুসলমানও নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করছেনা। বিশাল বিশাল সুসজ্জিত মসজিদগুলো ফাঁকা। অপরদিকে অন্যায় ও অপরাধের আড্ডায়, নিষিদ্ধ সব পল্লী, গৃহ ও এলাকায় উপচে পড়া ভীড় দেখা যায়।

সুদের বাজার আজ তুঙ্গে। এই কালো হাতের নখর এতই প্রসারতা পেয়েছে যে, এর থাবা থেকে বাঁচার ইচ্ছা করলেও বাঁচতে পারবেনা কেউ। এ সুদি কালো হাতের নখর তাকে রক্তাক্ত করবেই। আজ মুসলমরদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে হারাম সুদ ভক্ষণ করতে।

আমরা দিন দিন হীনমন্যতার গভীর আঁধারে ডুবে যাচ্ছি। আজ আমলদার মুসলমানকে পথে ঘাটে কটুক্তি করা হচ্ছে। তাদেরকে 'মাসজিদের মোল্লা' বলে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। দাড়ি ও সুন্নতি পোষাককে তথাকথিত আধুনিকতাবাদীরা জংগীপনা বলে গালি দিচ্ছে। আলিম সমাজকে বলা হচ্ছে মধ্যযুগীয় বর্বর ও প্রগতি ও আধুনিকতার এক নম্বর প্রতিবন্ধক। রাস্তা-ঘাটে চলাচলের সময় কিছু লোক আছে যারা আলিম সমাজকে দেখলে তাদের প্রতি অপমান সূচক বাক্য ছুড়ে দেয়। বিভিন্ন ইঙ্গিত আকারে তাদেরকে অপমান করে। আমার কথাই মনে করেন, আমি কলেজের ছাত্র। সুন্নতি পোষাক পরিধান করার পূর্বে যখন রাস্তাঘাটে ও গাড়ীতে চলাচল করতাম তখন আমাদের সমাজের অজ্ঞ মানুষের (এখানে অজ্ঞ বলতে বর্তমান সমাজের ইসলামিক জ্ঞান রাখেনা এমন লোকদের বুঝানো হয়েছে) আমাকে খুব সম্মান করত। গাড়ীতে চড়ে বসলে ভাড়া যা দিতাম তাই নিত। কখনও প্রশ্ন করতনা ভাড়া ঠিক দিলাম কি দিলাম ? বরং আমাকে ভালো সিটে বসানেরা জন্য ব্যস্ত হয়ে যেত। আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি সব সময় সুন্নতি পোষাক পরিধান করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এখন রাস্তা - ঘাটে ও গাড়ীতে চলাফেরা করলে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অপমানিত ও লজ্জিত হতে হয়। অথচ পূর্বের পোষাকের চেয়ে বর্তমান পোষাকের মর্যাদা অনেক বেশী। গেল রমজান মাসের ঘটনা, একজন মাদ্রাসার হুজুর (শিক্ষক) এক দোকানে কিছু কাপড় কিনতে গিয়েছিলেন। সেই শিক্ষককে আসতে দেখে কাপড় দোকানের মালিক বলে উঠল, "হুজুর আমাদের যাকাত দেয়া শেষ, আপনি চলে যান।" এরা মনে করে যাকাত আদায় করাই হুজুর বা আলিম সমাজের কাজ। তারা ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদার জন্য যায়। চাঁদার উপর নির্ভর করেই মাদ্রাসা চালায়। কিন্তু বাস্তবে তাই মাদ্রাসা চালানোর জন্য চাঁদার উপর অনেকটা নির্ভরশীল, কেন? মাদ্রাসা পরিচালনা করার জন্য এরচেয়ে সম্মানজনক পথ কি আর নেই? আমাদের আলিম সমাজের কাজ কি চাঁদা আদায় করা? যাকাত ও কোরবানীর চামড়া ব্যতীত কি মাদ্রাসা চলে না ? যাকাত আদায়ের পোটলা (থলে) নিয়ে ঘোরায় অভ্যস্থ করা হচ্ছে কেন মাদ্রাসা ছাত্রদের? ভিক্ষার ঝুলি বহন করাই কি তাদের জীবন? মানুষের কাছে হাত পেতে দান গ্রহন করাই কি? তাদের পেশা? অথচ ইসলাম ভিক্ষা গ্রহনকারীকে ঘৃণার চোখে দেখে। আর এই ঘৃণার শিকার আজ আমাদের আলিম সমাজ। এর কারণে তারা আজ চরমভাবে হীনমন্যতায় ভুগছে। তালিবে ইলমরা মাদ্রাসার বাইরে গেলে মাথার টুপি খুলে পকেটে রাখে, ওস্তাদদের বিশেষ তাকিদ্ সত্বেও ছাত্ররা দাড়ী মুন্ডন করে , ছোট করে রাখে, অনেক ছাত্র আজ দাড়ী রাখা লজ্জা বা নোংরামি মনে করে। কেন সৃষ্টি হয়েছে মাদ্রাসা ছাত্রদের মাঝে এই হীনমানসিকতা ? কেন আজ মুসলমানরা নামাজ আদায় করেনা? ইচ্ছা থাকা সত্বেও কেন আমরা সুদের কালো হাতের থাবা থেকে রক্ষা পাচ্ছিনা? সুদ খেতে কেন বাধ্য হচ্ছি? সম্মানিত আলিম সমাজ কেন আজ অমর্যদা ও হীনমন্যতার শিকার?

আলিম সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় , তারা তাদের পরিবারের ভরন-পোষণ ঠিকমত করতে পারেনা। ছেলে -মেয়েদেরকে সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেনা। চিকিৎসা করাতে পারেনা। অনাহারিতা দিন দিন বেড়েই চলছে। কেন এই পরিস্থিতি? শুধু মাসজিদে নামাজ পড়ানোই কি একজন আলেমের কাজ? মাদ্রাসায়

কুরআন ও হাদীসের দরস্ দেয়াই কি তার কাজ? হুজুর (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের কাজ কি শুধু মাসজিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? তারা কি শুধু কুরআন ও হাদীসের দরস্ দিতেন? না অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেন? হুজুর (সাঃ) খায়বরের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের মাল দিয়ে তাঁর পরিবাবের ১১ মাসের খরচ এক সঙ্গে দিয়েছিলেন। সাহাবীরা গনিমতের অর্থ দিয়ে পরিবারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন, এতিমদের খানার ব্যবস্থা করতেন। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা তাদের উত্তরসূরী হয়েও কোরবানীর চামড়া দিয়ে মাদ্রাসা ও মক্তব চালাই। মাসজিদ ও মাদ্রাসা থেকে অর্জিত বেতন দিয়ে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করি, কেন?

কেন আমরা আজ রাসূল (সাঃ) এর দেখানো পথে কাজ করছিনা? কেন আজ বদর, ওহুদ,খায়বর এর রাসূল (সাঃ) এর সেই দেখানো আমল থেকে বিচ্যুত? জিহাদের কথা শুনলেই আমরা কোন এক অজানা ভয়ে শংকিত হয়ে উঠি। এ কাজে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) নিদারুণ জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাই আমাদের উপর জুলুম আসা বিচিত্র কিছু নয়। তাই রাসূল (সাঃ) এর আদর্শ থেকে মুসলিম জাতি কখন বিচ্যুত হতে পারেনা, হবেও না। আমাদের উপর কি কাফের ,মুশরিক, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান আর পৌত্তলিকদের স্টিম রোলার চালিত হচ্ছেনা? আমাদের মা-বোনরা কি ধর্ষিতা হচ্ছেনা? আমাদের সামনে কুরআন ডাস্টবিনে নিক্ষেপিত হল কিন্তু সামান্য মিছিল আর মিটিং করেই হলাম ক্ষান্ত যেন আমাদের উপর দায়িত্ব ষোল আনায় করা হয়েছে। আজ আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুদ নিতে এবং দিতে বাধ্য। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের উপর চাপানো হচ্ছে নমরুদের দাবানল। আমাদের সামনে বাবরী মাসজিদকে শহীদ করা হয়েছে। গুজরাটে মা-বোনদেরকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করে টুকরা টুকরা করে কেটে অগ্নিদগ্ধ করা হলো। অর্ধ শতাব্দীর বেশী সময় ধরে কাশ্মীরে চলছে হত্যা যজ্ঞ। সেখানে এক বৃদ্ধ পিতার সামনে তার যুবতী কন্যাকে উলঙ্গ করে ভারতীয় ভূতপূজারীরা গণধর্ষণ করেছে। বৃদ্ধ পিতা এ পৈশাচিক আচরণ সহ্য করতে না পেরে চক্ষু বন্ধ করতে চাচ্ছিল ঠিক তখন ভারতীয় ইব্‌লিশের উত্তরসূরীরা রাইফেলের বেয়োনেটের দ্বারা চোখে আঘাত করে বলল তোকে এ নারকীয় কান্ড স্বচক্ষে দেখতে হবে।

গুজরাটে আমার এক বোনকে সত্তরজন হিন্দু নরপিশাচরা টেনে হিঁচড়ে জঙ্গলে নিয়ে তার উপর হিংস্র পশুর ন্যায় ব্যবহার শুরু করলে, আমার সে বোন চিৎকার করে বলতে লাগল-হে সর্ব শক্তির মালিক! আল্লাহ! তোমার সৃষ্টি জগতের মধ্যে এমন কি কোন যুবক নেই? যে আমাকে এ নরপিশাচদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে? হে বিশ্ব মুসলিম জাতির কর্ণধার আলিম সমাজ এর পরও কি তোমরা বলবে জিহাদ ফরজে কিফায়া? প্রচলিত আইনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল? সরকার মহলের চোখ রাঙ্গানীর কারণ? তাহলে হাশরের মাঠে রাসূলের সামনে মুখ দেখাবে কি করে? তোমরা রাসূলের ওয়ারিশ। এ কেমন ওয়ারিশ তোমরা শুধু ভালোর ভাগ নিতে চাও । কষ্ট আর নির্যাতনের ভয় যেখানে সেখানে তোমাদেরকে কি তাহলে পাওয়া যাবেনা? না তা কখনোই হতে পারেনা । নবী করিম (সাঃ) এর ওফাতের পর থেকে যতগুলো জিহাদ হয়েছে প্রত্যেকটিতে আলিম সমাজের ভূমিকা ছিল অগ্রগন্য। তাই আজ সময় এর চাহিদায় তোমরা থাকবেনা পিছে।

সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জাতির আহাজারী আর আর্তনাদ কর্ণগোচর হয়না তোমার? এরপরও কি তুমি থাকবে তোমার মাসজিদ,মাদ্রাসা আর খানকা নিয়ে । থাকবে কি চাকুরি নিয়েই ব্যস্ত? তোমার বিবেক কি জাগবেনা কখনোও? তাদের ডাকে কি সাড়া দিবেনা?

প্রতিদিন হাজার হাজার নারী, শিশু, বৃদ্ধ জীবন দিচ্ছে । সামান্য একটি পাখির মূল্যও নেই তাদের জীবনের। কোথায় সেই শান্তির ধ্বজাধারী মানবাধিকার। মানবাধিকার কি শুধু ইয়াহুদী, খৃস্টান, বৌদ্ধ আর পৌত্তলিকদের জন্য ? সত্যিই তাই। মুসলমানদের জন্য ওরা কেউ নয়। ওদের আশা না করে আসুন জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ি। আজ জিহাদ ছেড়ে দেয়ার ফলে আমাদের এ করুণ পরিণতি। অথচ জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার সকল উপকরণ ও শর্ত সম্পূণরূপে বিদ্যমান রয়েছে। নেই কেবল জিহাদ করার মানসিকতা। শয়তানী প্ররোচনা ও হীনমন্যতা ত্যাগ করে যদি জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ি, দেখবো কিভাবে আল্লাহর সাহায্যের দরজা আমাদের জন্য অবারিত হয়ে আছে। আমাদের আধুনিক অস্ত্র না থাকতে পারে হৃদয়ের উত্তাপ ও রক্ত প্রবাহের জজবাতো আছে, যে রক্তধারা বাতিলকে পরাজিত করতে পারে খুব সহজে খুব অল্প সময়ে। আমার প্রিয় মুসলমান নওজোয়ান, নবীন ভায়েরা! আজ প্রয়োজন সাহসী পদক্ষেপের। আমরা যদি এখনও জেগে না উঠি, তবে ওরা সবাই মিলে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। আমরা যদি এখনও মাদ্রাসা, মক্তব, মাসজিদ এর খেদমতকেই একমাত্র আমাদের দায়িত্ব মনে করি তবে সেই দিন বেশী দূরে নয় যখন পুনরাবৃত্তি ঘটবে বাগদাদের ইতিহাসের, ফিলিস্তিনের ইতিহাসের। নিজ দেশেও বসবাস করে কাশ্মীরের মত পরাধীনতা জুটবে আমাদের ভাগ্যেও।

পরিশেষে বলতে চাই হে উম্মতি মুহাম্মাদী মনে রেখ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন-" আমার উম্মতের উত্তম রিজিক রয়েছে বর্ষা নিক্ষেপের মধ্যে।" তাই আমরা আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করে রিজিকের ব্যবস্থা করি। এতে দেখা যাবে সমাজের অন্যায়ও বন্ধ হবে এবং আমাদের সম্মানও প্রতি পদে পদে বৃদ্ধি পাবে। আর একটা কথা মনে রাখবেন আমাদের শরীরের খুন হযরত হানযালা (রাঃ) এর খুনের চেয়ে বেশী দামী নয়। আমাদের শরীরের খুন ও জান হুজুরে পাক (সাঃ) এর খুন ও জীবনের চেয়ে বেশী দামী নয়।

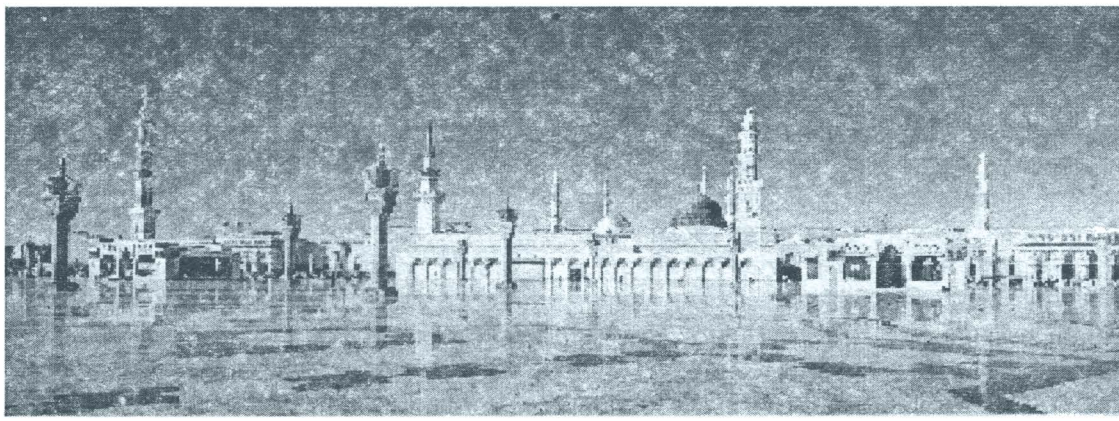

ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আদর্শ

-সাখাওয়াত বিন তাহের

Islam is the complete code of life.

ইসলাম একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। বস্তুতঃ ইসলাম একটি সার্বজনীন সফল বিপ্লবের পথ প্রদর্শক ও চিরন্তন আহবায়ক। একমাত্র ইসলামই আনতে পারে মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ধারা।

সুতরাং মানব -অধ্যায় ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। যার কোনই বিকল্প নেই। আর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে ও বাস্তবায়ন করতে -চাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

কেননা ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণতা ,পারিবারিক জীবন ব্যবস্থাপনা ছাড়া সম্ভব নয়। আর পারিবারিক জীবনের সফলতা নির্ভর করছে সামাজিক ব্যবস্থার উপর। আর সামাজিক জীবনের কল্যান নিহিত রাষ্ট্রীয় জীবনের কল্যান ও সফলতার উপর। আর রাষ্ট্র জীবনে কল্যান ও শান্তি-শৃঙ্খলা সুনিশ্চিত হতে পারে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমেই। যার বাস্তব সত্যতার প্রমাণ ও নজির স্থাপনু করে গেছেন আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে, একমাত্র ইসলামী সার্বজনীন স্বীকৃত সফল ও মহা-নায়ক হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।

যার স্বরূপ ছিল এই ঃ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরব সহ সমকালীন বিশ্ব ছিল তমাসাচ্ছন্ন। পারিবারিক,সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ছিল বড়ই নাজুক ও নির্মম। বিশেষত ঃ আরবে সুশৃঙ্খল ও সুসংগটিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিলনা। গোটা আরব জাতি ছিল সভ্যতা বিচ্ছিন্ন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দূরহ পরিবেশ। প্রত্যেক গোত্রপতিই তার শাসনকর্তা ছিল। কোন গোত্রই অপর গোত্রের অধিনস্ত ও কর্তৃত্ব মেনে নিতনা । যার ফলে পরস্পরের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকত। কালের আবহমান এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে নবী করীম (সাঃ) শুধু আরবেই নয় গোটা মানব জমিনের আদর্শরূপে ওহীর বিধানের আলোকে এমন এক ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করলেন যা মানব ইতিহাসে সর্বোত্তম ও সর্বোপরি জন-কল্যানমূলক একমাত্র রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত। এ রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র, সুসংহত ও সুদীর্ঘ ইতিহাসে এক অভিনব-অপূর্ব সংযোজন। এর সার্বিক প্রশাসনিক অবকাঠামো ছিল নবী করিম (সাঃ) এর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে গঠিত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃত, কর্মসূচী ঐতিহ্য ও অনন্য বৈশিষ্টের প্রেক্ষিতে গড়া। মূলতঃ রাসূল (সাঃ) এর এ রাষ্ট্র ব্যবস্থাই ছিল গোটা বিশ্ববাসীর জন্য এক উত্তম আদর্শ।

*** ১. সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ ঃ**

তৎকালীন আরব বিশ্বে একশ্রেণীর লোক ছিল শাষক ও নির্যাতক আর অন্যরা ছিল শাসিত ও নির্যাতিত , মানুষে- মানুষে ছিল বংশীয় পার্থক্য, উঁচ-নিচু ও আশরাফ- আতরাফে দ্বিধা-বিভক্ত, পার্থিব স্বার্থের জন্য গঠিত সামাজিক বৈষম্যের তিনি মূলোৎপাটন করেন । সকল আভিজাত্যের গৌরব ও বংশ মর্যাদার ভেদাভেদ দূর করে রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করলেন তোমাদের মধ্যে 'সেই উত্তম যে সব চেয়ে বেশী খোদাভীরু ও মুত্তাক্বী"। (আলহাদীস)

*** ২. সর্বাত্বক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ঃ** রাসূল (সাঃ) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষে সর্বপ্রথম 'মদীনা সনদ' ঘোষণা করে সর্বাত্বক ঐক্য কায়েম করেন, যা বিশ্ব ইতিহাসে সৃষ্টি করে এক নতুন ইতিহাসের উজ্জল ধারা। এ সনদের মাধ্যমে তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিবিশেষে সকলকে এক সুত্রে গাঁথেন এবং মদীনাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের নগর রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করেন। আর এ সনদই ইতিহাসে

প্রথম লিখিত সংবিধান। মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামের বিস্তৃতি এর মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ে এবং সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

*** ৩. শক্তিশালী প্রশাসন ব্যবস্থা ঃ** নবী করীম (সাঃ) রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সুসংহত প্রশাসন গড়ে তুলেছিলেন। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন নবীজী স্বয়ং। প্রতিনিধি ও কর্মচারী নিয়োগ, জিজিয়া আদায়কারীর নাম ঘোষণা, মুয়াজ্জিন নির্বাচন, ইমাম নির্ধারণ, যাকাত আদায়কারী নিয়োগ ভিন্ন ধর্মালম্বীদের সাথে চুক্তি সাক্ষর করা, জমি-জমা বন্টন করা, সেনা-বাহিনী সজ্জিত করা, ফরমানজারী করা মাসআলার সমাধান, রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সঠিক সমাধান ও শৃঙ্খলা বিধান করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ন কাজ নবীজী সুন্দর ও কঠোর ভাবে আঞ্জাম দিতেন। ইসলামের বিস্তৃতির ফলে গোটা রাষ্ট্রকে তিনি কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং যোগ্য এবং যোগ্য শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। প্রশাসনের মজবুতির জন্য তিনি সেক্রেটারিয়েট গঠন করেন। বিচার, লিপিকার, গোপন চিঠিপত্র ও অনুবাদ, হিসাব রক্ষা, রাজস্ব, পররাষ্ট্র বিষয়ক, নিরাপত্তা, পুলিশ, স্বাস্থ্য, নগর, প্রশাসন, শিক্ষা, শহর উন্নয়ন ও প্রকৌশল, সামরিক, সীল-মোহর ও সাহিত্য বিভাগ ছিল রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ও সংস্থাসমূহের অন্তরভূক্ত বিষয়াবলীর অন্যতম। এসব বিভাগের নির্ধারিত তদারককারীও ছিলেন আলাদা আলাদা।

*** ৪. জনমতের মূল্যায়ন ঃ** রাসূল (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মূলনীতি ছিল জাতীয়তা, ধর্ম-বর্ণ ও বংশ নির্বিশেষে সমগ্র মানব সভ্যতার কল্যানে কাজ করা এবং ন্যায়পরায়নতার সাথে প্রত্যেকের অধিকার ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। তাই রাসূল (সাঃ) জনমতের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করেন। কেননা জনমতের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন ইসলামের দৃষ্টিতে অতি পছন্দনীয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন –" কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।" (আল-ইমরান-১৫৯)
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকলের স্বাধিন মতামত প্রকাশ করার অধিকার নিশ্চিত রয়েছে। কেননা জনগণের অভিমত ও সহযোগিতা রাষ্ট্রের ভিত্তি বলে ইসলাম মনে করে। এজন্য নবীজী (সাঃ) একটি 'মজলিসে শুরা' গঠন করেছিলেন। শুরার সদস্য নির্বাচন হত মুত্তাকী, আমানতদার, বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাবান, ন্যায়বিচারক, পদলোভহীন, সৎসাহসী ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারীদেরকে। পরমর্শ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন–" আমি রাসূল (সাঃ) অপেক্ষা অধিক পরামর্শ করতে অন্য কাউকে দেখিনি। (আল-হাদীস)
তবে এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যবস্থা প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত গণতান্ত্রিক নীতি মানব অধ্যায় সুখ সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির ধারা নিশ্চিতকরণ ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পরিপন্থি। যার বিস্তারিত আলোচনা অদ্যবিষয়ভিত্তিক নয়।

*** ৫. পররাষ্ট্রনীতি ঃ** রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নবী করীম (সাঃ) এর অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে অপূর্ব রাজনৈতিক বিচক্ষণতা। তিনি প্রথমেই মদীনাকে বহিঃশত্রুর আক্রমন থেকে রক্ষা করেন এবং ইয়ামন, আম্মান, বাহরাইন, ইরানী দখলদারী ও সিরিয়ার পাশ্ববর্তী এলাকা থেকে রুমীয়দের কর্তত্ব তুলেদেন। আবিসিনিয়া, রোম, পারস্য ও মিসরের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে দূত মারফত চিঠি দিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দেন। রাসূল (সাঃ) সব সময় চেষ্টা করতেন। বহির্বিশ্বের সাথে তার সম্পর্ক যেন ভাল থাকে। বিশেষ করে তিনি সুনাম বিস্তৃত ছড়িয়ে দেন।

*** ৬. জানমালের নিরাপত্তা বিধান ঃ**
একটি দেশের সর্বসাধারণ বা নাগরিকরা চায় যে তাদের জানমাল নিরাপদ থাকুক। নবীকরীম (সাঃ) এজন্য নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা ও জনজীবনের মানোন্নয়নের লক্ষে সুন্দরতম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অবশ্য এজন্য কোন নিয়মিত বাহীনী ছিলনা। তবে কতিপয় সাহাবা (রাঃ) স্বেচ্ছায় নিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। বায়তুলমাল থেকে তাদের ব্যয়ভার বহন করা হত। আর এ বিভাগে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন কায়েস ইবনে সামিত প্রমুখ অপরাধ দমন, বাজার পরিদর্শন , ওজন ও মাপনিয়ন্ত্রন ও নিরপাপত্তা বিভাগ দেখাশুনার কাজে নিয়োজিত। নবীজী (সাঃ) এর এসব বিষয়ে সুন্দর ও সুনিপুন কর্মপদ্ধতি দেখে, আধুনিক বিশ্বের অত্যতম চিন্তানায়ক, গভেষক ও দার্শনিক মাইকেল এইচ হার্ট নবীজী (সাঃ) সম্পর্কে মন্তব্য করেন– "He was the only man in history who supremly successful on both the Religious and seculer levels."

*** ৭. সামরিক ব্যবস্থাপনা ঃ** রাসূল (সাঃ) রাষ্ট্রের সার্বিক প্রতিরক্ষার স্বার্থে ইসলামী বিপ্লবের সংঘাতময় উত্তরণের জন্য প্রত্যেক নাগরিককে সুদক্ষ সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। শত্রুদের সাথে মোকাবিলা কতে প্রয়োজনানুসারে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তরবারী ,তীর, ধনুক, বল্লম নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র, দাব্বাবাহ ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করেন। মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে যুদ্ধের বিভিন্ন কলাকৌশল ও আইন কানুন শেখানো হত। প্রকৃত কিংবা সম্ভাব্য শত্রু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় খবরাদি সংগ্রহের জন্য একটি গোয়েন্দা সংস্থাও প্রস্তুত করেছিলেন। সে যুগে আরবে যুদ্ধ হত এলোপাথারিভাবে, আক্রমন -প্রতিআক্রমনের মাধ্যমে। নবীজী এ সনাতন পদ্ধতি অতিক্রম করে সারিবদ্ধভাবে সৈন্য সমাবেশ করার নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে মাহমুদ গানদুয বলেন– "আধুনিক সমর নীতির তথাকথিক Mosscomes এর যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে প্রিয় নবীজীর (সাঃ) সমর নীতিতে"
* ৮. সুবিচার প্রতিষ্ঠা ঃ নবী করীম (সাঃ) সকলের জন্য সুবিচার কায়েম করে এক মহান আদর্শ স্থাপন করেন।

তিনি এমন বিচার ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন সেখানে কাউকে স্বজনপ্রীতি করা হতনা। এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ), যারা আঞ্চলিকতার প্ররোচনা করে তারা আমাদের দলভূক্ত নয়। একবার ওয়াসেলা ইবনে আসফা জানতে চাইলেন হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আঞ্চলিকতা কি? জবাবে তিনি বললেন, অন্যায়ভাবে স্বগোত্রিয়দের সাহায্য ও পক্ষ সমর্থন করা। (আবুদাউদ) তিনি অপরাধীক গ্রেপ্তার করার পর বিচারে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত হলে তা কার্যকর করতে কখনো কুন্ঠাবোধ করতেন না। নবীজী (সাঃ) সুবিচারের জন্য শাসন বিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে আলাদা করেছিলেন। ইসলামের বিস্তৃতির ফলে মহানবী (সাঃ) প্রাদেশিক ও স্থানীয় বিচারক নিয়োগ করেছিলেন। তাদের অধিকাংশই ছিলেন ফকীহ্ ও প্রাজ্ঞ ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী।

*** ৯ আদমশুমারী ঃ** আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আদমশুমারী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র পরিচালকদের নিকট জনগণের সুষ্ঠু তালিকা থাকা অত্যবশ্যকীয়। অথচ নবীজী অনেক পূর্বেই তার বাস্তবতা অনুধাবন করে, রাষ্ট্র গঠনের কিছুদিন পরেই আদমশুমারী করেছিলেন। হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে নবীজী (সাঃ) ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মুসলিম জনগণের একটি পরিপূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করে পরিসংখ্যান বিভাগে তা সংরক্ষণের নির্দেশ দেন। পৃথিবীর দীর্ঘতম ইতিহাসে এটাই ছিল সম্ভবতঃ প্রথম লিখিত আদমশুমারী। নবীজীর জীবদ্দশায় দু-দুবার আদমশুমারী হয়েছিল।

***১০ নৈতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তার ঃ** একটি রাষ্ট্রের নাগরিকরা যত শিক্ষিত ও বিবেকবান হবে, সেই রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নতি হবে ততই সমাদ্রিত ও সমৃদ্ধশালী। নবী (সাঃ) মুসলমানদের জ্ঞানার্জনে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছিলেন। এমনকি বদর যুদ্ধের বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে প্রত্যেক দশ জনকে লেখা-পড়া শেখানোর বদলায় মুক্তি দেয়া হয়েছিল। নবীজী শিক্ষার প্রসারে শিক্ষিত সাহাবাদের নিয়োগ করেছিলেন। মদীনায় এজন্য সাঈদ ইবনুল আসকে (রাঃ) নিয়োগ করা হয়েছিল মসজিদে নব্বীকে সকল কর্মের কেন্দ্রবিন্দু করে। সেখানে একটি শিক্ষাকেন্দ্রে ও স্থাপন করা হয়েছিল। রাসূল (সাঃ) জনগণকে সর্বদা জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন–"জ্ঞানার্জন কর দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত" যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরোবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন।

*** ১১.নারী জাতির মর্যদা দান ঃ** Organ of the devil .A scorpoin ever ready to sting. The poisons asp.

প্রভৃতি অভিধায় বিশেষিত নারী জাতির মর্যদা ও উপযুক্ত সম্মান রাসূল (সাঃ) সুপ্রতিষ্ঠি করেন। তৎকালে নারীকে মানুষের সম্পূর্ণ সত্তার অধিকারী মানুষ বলে মনে করা হতনা। তারা ছিল অবাধ ও নির্বিচারে পুরুষ সমাজের ভোগ্যপণ্য বিশেষ। শুধু তাই নয়, পিতার মৃত্যুর পর বিধবা যুবতী স্ত্রীর হকদার হত তার সন্তানগণ। সামাজিক এই কদর্যতা থেকে মানুষকে নৈতিক জীবরূপে গড়ে তোলার জন্য রাসূল (সাঃ) বিবাহ সংক্রান্ত বিধান জারী করেন –" যাদেরকে তোমাদের পিতাগণ স্ত্ররূপে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে তোমরা বিবাহ করবেনা। এটা অত্যন্ত ঘৃনিত ও কদর্য আচরণ ও অমানবিক, অশালীন, অসভ্যতার নামান্তর, বস্তুতঃইহা একটি পাপ পথ। (আল-কুরআন) নারী অধিকার সংস্কারে রাসূল (সাঃ) এর অবদান সম্পর্কে এডওয়ার্ড গেবন বলেন–" বহু বিবাহের স্বেচ্ছাচার চার এ কমিয়ে আনা হয়েছে। তালাকের অনর্থক অপব্যবহারের স্বাধীনতা হয়েছে নিরুৎসাহিত। মৃত্যদন্ডের উপযোগী দন্ডনীয় হয়েছে ব্যভিচার। অবিবাহিত যৌন সংসর্গের জন্য করা হয়েছে শত বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা। ফলে নারী জাতি বিশ্ব দরবারে কল্যানময়ী ও পূন্যময়ীরূপে আবির্ভূত হন।

*** ইতিবৃত্ত ও মূল বক্তব্য ঃ** রাসূল (সাঃ) মদীনায় যে সমৃদ্ধশালী কল্যানময় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ছিল একটি উদীয়মান নিয়মিত সরকার ব্যবস্থা। আর এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর দূর হয়েছিল জাহেলী যুগের সকল পাপ- পঙ্কিলতা, বর্বরতা। পক্ষান্তরে বিপর্যস্ত মানবতা ফিরে পেয়েছিল উজ্জল নবজাগরণের পথের দিশা। গোটা বিশ্বজুড়ে নেমেছিল তখন এক অফুরন্ত শান্তির ধারা। আজ সমগ্র বিশ্বে হত্যা-সন্ত্রাস, বিভীষিকা, স্বার্থপরতা, দূর্নীতি, অরাজকতা ও চরম নৈতিক অবক্ষয়ের জোয়ার বইছে, সুসভ্য জাতি এসেছে পশুত্বের পর্যায়ে। আর এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে রাসূলের (সাঃ) অনুস্মরীয় কর্ম পদ্ধতির কোন দোসর বা বিকল্প নেই। আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ট মণিষী জর্জ বার্নাড 'শ' এর ভাষায় – " If all the world was united under on leader Muhammad would have been the best fitted man to lead the peoples of verious creeds, dogmas and ideas to peace and happiness."– সমগ্র দুনিয়াটাকে যদি একত্র করে একজনের নেতৃত্বে আনা যেত, তাহলে নানা ধর্মমত, ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তার মানুষকে সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তির পথে পরিচালনার জন্য মুহাম্মাদ (সাঃ)-ই হবেন একমাত্র সর্বোত্তম যোগ্য নেতা। (চলবে)

তাকলীদ পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

মাওঃ মুহাম্মাদ ইসহাক ফরিদী

ইসলামী শরীআতের মূল উৎস হল,কুরআন ও হাদীস। পরবর্তীতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সম্পূরক আরো দু'টি উৎস তথা ইজমা ও কিয়াসের সংযোজন ঘটে। এই দলীলচতুষ্টয়ের ভিত্তিতে ইমাম ও মুজতাহিদগণ ইসলামী শরীঅতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং একে বিন্যাস্ত করেছেন। কুরআন হাদীস এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং ইজতিহাদ দৃষ্টিভংগীর পার্থক্যের দরুণ মুজতাহিদ ইমামগণের সিদ্ধান্তে বিভিন্নতা দেখা দেয়। এর ফলে বহু মাযহাবের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী সময়ে সে সবের মধ্যে চারটির উপরে মুসলিম উম্মাহর ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চারটি মাযহাব হল (১) হানাফী (২) মালিকী (৩) শাফিঈ (৪) হাম্বলী।

এই চার মাযহাবের যে কোন একটির অনুসরণ বা তাকলীদ করলেই কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ হয়ে যাবে। বস্তুত তাকলীদ শব্দটি আরবী। এর অর্থ গলায় মালা বা হার পরিয়ে দেওয়া। ফিক্হ শাস্ত্রের নীতিমালা। বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মতে তাকলীদের সংগা হল, অর্থাৎ দলীল-প্রমাণ অন্বেষণ ব্যতীত কোন মুজতাহিদ ইমামের কথা অনুসারে আমল করাকে তাকলীদ বলা হয়। (কাওয়ায়িদুল ফিকহ্ -মুফতী আমীনুল ইহসান (রহঃ) "দলীল-প্রমাণ অন্বেষণ ব্যতীত " এ কথার মানে হল, মুকাল্লিদ- তার ইমামের প্রতি এরূপ আস্থা পোষণ করবে যে, অনুসরনীয় বিষয়ে আমার ইমামের নিকট প্রমাণ তো অবশ্যই আছে এবং তা সত্যও বটে। কাজেই প্রমাণ পেলে অনুসরণ করবো, অন্যথায় করবো না,-এরূপ দুঃশ্চিন্তার আমি শিকার হবোনা। অবশ্য কোন ইমামের তাকলীদ করার পর প্রমাণ জানতে সচেষ্ট হওয়া তাকলীদ এর পরিপন্থি কাজ নয়। উল্লেখ্য যে, কুরআন-হাদীসের মর্ম দুই-শ্রেণীতে বিভক্ত।

১. যে সব মর্ম অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত তা উদ্ধারে কোন রূপ অস্পষ্টতা, সন্দেহ -দ্বন্দের সৃষ্টি হয়না। যেমন- নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ফরয হওয়া এবং চুরি, যিনা, মদ্যপান ইত্যাদি হারাম হওয়া এসবের হুকুম-আহকাম কুরআন-হাদীস হতে সবাই উদ্ধার করতে সক্ষম। কাজেই এই শ্রেণীর আয়াত ও হাদীসের মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে ইজতিহাদও তাকলীদের কোন প্রয়োজন নেই। ২. এমন সব আয়াত ও হাদীস যার মধ্যে বাহ্যত কোন না কোন অস্পষ্টতা ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান আছে। যেমন কুরআন মদীদে এরশাদ হয়েছে, "তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন কুরূ পর্যন্ত (ইদ্দত পালনের জন্য) অপেক্ষা করবে। (২;২২৮) এ আয়াতে উল্লেখিত কুরূ শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। এর এক অর্থ- হায়িয এবং অন্য অর্থ পবিত্রতা । এখানে কোন্ অর্থটি উদ্দেশ্য তাতে দ্বিধা বিদ্যমান। তাই আয়াতের যুক্তিযুক্ত অর্থ নিরুপনে ইজতিহাদ প্রয়োজন-যা সাধারণ মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়।

অনুরূপবাবে হাদীস শরীফে আছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, " কোন ব্যক্তি যদি 'মুখাবারা' (বর্গচাষ) পরিত্যাগ না করে তবে সে যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। (আবুদাউদ; কিতাবুল বুয়ূ-পৃ:৪৮৩) এখানে বাহ্যতঃ অস্পষ্টতা এই যে, মুখাবারা (ভূমি চাষ ব্যবস্থা) বহু প্রকারের হতে পারে। যথা টাকার বিনিময়ে, ফসলের অংশের বিনিময়ে, নির্দিষ্ট পরিমান ফসলের বিনিময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানের ফসলের বিনিময়ে ইত্যাদি। এ হাদীসে কোন্ ধরণের মুখাবারা উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা উক্ত আয়াত ও হাদীসে যে অস্পষ্টতা রয়েছে তা নিরসনে হয়তো প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বিবেক ও বিবেচনা অনুযায়ী আমল করবে অথবা কোন মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করবে আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, এরূপ বিষয়ে সাধারণ মানুষ নিজ বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে গেলে মারাত্মক ভ্রান্তির আশংকা রয়েছে । তখন যত মানুষ তত মাযহাব সৃষ্টি হবে ইসলামের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবে । এমনকি ইসলামের অস্তিত্বই আর অক্ষুন্ন থাকবেনা। পক্ষান্তরে কুরআন হাদীস বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণে সে আশংকা থাকেনা। এই কারণেই ইমাম চতুষ্টয়ের কোন একজনের তাকলীদ ও অনুসরণ করাকে সর্বসম্মত রায় অনুসারে অপরিহার্য বলে সাব্যাস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইমামের অনুসরণ করার মানে কুরআন ও হাদীসকে বাদ দেওয়া নয়। বরং কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করার জন্যই কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যাকার হিসেবে তাদের অনুসরণ করা। কেননা তাদের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব নয়। বরং সেটা হবে নফস্পরাস্তী বা আত্মপূজা। পক্ষান্তরে যারা তাকলীদের বিরুদ্ধে প্রলাপোক্তি করে তারাও প্রকৃত পক্ষে কারো না কারো অবশ্যই তাকলীদ করে। যেমন এ হাদীসটি সহীহ বা

যঈফ (দূর্বল) বা মুনকার – একথা আমরা কিভাবে বলতে পারি? যারা সারা জবিন সাধনা করে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন তাদের অনুসরণ করেই আমরা একথা বলি। আমরা বলি এ হাদীসটি বুখারী শরীফে আছে, কাজেই এটি সহীহ। এভাবে বলে আমরা কি মূলতঃ ইমাম বুখারী (রঃ) এর অনুসরণ (তাকলীদ) করছিনা? এক্ষেত্রে যদি তাকলীদ বৈধ হয় তাহলে ফিকহের ক্ষেত্রে তাকলীদ বৈধ হবেনা কেন? বস্তুতঃ তাকলীদ দুই প্রকার। (১) তাকলীদে মুতলাক (২) তাকলদি শাখ্সী । (১) তাকলীদে মুতলাক মানে হল, নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাকলীদ না করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইমামের মতের অনুসরণ করা। (২) তাকলীদে শাখসী অর্থাৎ শরীঅতের সামগ্রীক বিষয়ে নির্দিষ্ট একজন ইমামের অনুসরণ করা। ধর্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় তাকলীদের কোন প্রয়োজন ছিলনা। কেননা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকেই সমাধান পাওয়া যেত। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর ওহীর মাধ্যমে নতুন বিষয়ে সমাধান লাভকরা- করার ধারা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ইজতিহাদ ও তাকলীদের মুতলাকই অধিক প্রচলিত ছিল। এই তাকলীদে মুতলাকের ধারা ক্রমান্বয়ে তাকলীদে শাখসীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। অতঃপর হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী এই চার মাযহাবের কোন একটির অনুসরণ (তাকলীদে শাখসী) এর উপর মুসলিম উম্মাহর ইজমা সংঘটিত হয়। বর্তমানে তাকলীদ বলতে তাকলীদে শাখসীকেই বুঝানো হয়ে থাকে। তাকলীদে শাখসীর অপরির্যতার উপর কুরআন এবং হাদীসেও বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্ত এই দাবীটি যুক্তিসম্মতও বটে। কেননা কুরআন ও হাদীসের সঠিক মর্ম উদ্ধার করে এর উপর আমল করা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই শরীআত মুতাবিক আমল করার জন্য কোন না কোন ইমামের অনুসরণ অবশ্যই অপরিহার্য।

কুর আন মাীদে ইরশাদ হয়েছে– " তোমরা যদি না জান, তবে আল্লাহ্র প্রেরিত কিতাবের ইল্ম (জ্ঞান) যাদের আছে; তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর।" (১৬-৪৩)

এ আয়াতে যারা জানেনা, তাদেরকে আলিমদের নিকট জিজ্ঞাসা করার হুকুম করা হয়েছে। এর দ্বারা তাকলীদের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়। তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেন–" আমি জানিনা, কতদিন পর্যন্ত তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান থাকবে। সুতরাং তোমরা আমার পরে এই দুইজনের অনুসরণ (তাকলীদ) করবে। অর্থাৎ আবুবক্র ও উমরের অনুসরণ করবে।"

(মিশকাত (তিরমিযী) পৃ:৫৬০)

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পরবর্তীতে দুইজন খলীফার প্রতি ইংগিত রয়েছে এবং তাদের খিলাফতকালে তাদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশও এতে বিদ্যমান রয়েছে। আর এই কথা সকলেরই জানা যে, এক সময় একজনই মাত্র খলীফা হয়ে থাকেন। দুইজন নয়। সুতরাং যিনি যখন খলীফা থাকবেন, তখন শুধুমাত্র তারই অনসরণ করতে হবে। বলাবাহুল্য; নির্দিষ্ট কোন একজনের কথা মান্য করাকেই তাকলীদে শাখসী বলা হয়। অতএব তাকলীদে-শাখসীর অপরিহার্যতার কথা উক্ত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতার বিষয়টি যৌক্তিকভাবেও প্রমাণিত। কেননা পূর্ববর্তী মুসলমানদের সময়কাল নবী করীম (সাঃ) এর যুগের কাছাকাছি হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণ ছিলনা বললেই চলে। তাঁরা সুবিধা লাভের নিমিত্তে তাকলীদে মুতলাক করতেন না। বরং যখন যে বিষয়ে যার ফয়সালা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন, তখন তাঁরা তাঁর ফয়সালাই গ্রহণ করতেন।

পক্ষান্তরে পরবর্তীতে মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং সুবিধা লাভের নিমিত্তে নিজ নিজ চাহিদা মত বিভিন্ন মুজতাহিদের ফয়সালা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এহেন অবস্থায় তাকলীদে মুতলাক অনুযায়ী যে কোন ইমামের অনুসরণ দ্বার অবারিত থাকলে শরঈ বিধি-বিধান খেল-তামাশায় পরিনত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাড়ায়। যেমন ইমাম শাফিঈ (রঃ) এর মতে শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে তাতে উযু ভঙ্গ হয়না, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর মতে উযু ভঙ্গ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ইমাম শাফিঈ (রঃ) এর মতে মহিলাদের শরীর স্পর্শ করলে তাতে উযু ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর মতে উযু ভঙ্গ হয়না। এ অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি উক্ত মতপার্থক্যের সুযোগ নিয়ে রক্ত প্রবাহিত অবস্থায় ইমাম শাফিঈ (রঃ) এর এবং মহিলাদের শরীর স্পর্শ করার অবস্থায় ইমাম আবুহানীফা (রঃ) এর অনুসরনের দাবী করে তবে তা বৈধ হবেনা। কারণ এরূপ করা সুবিধাবাদী মনোভাবের পরিচায়ক। এহেন সুবিধাবাদের দ্বারা শরীআতের মাসআলা-মাসাইল হালকা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। এই জন্যই মাযহাব চতুষ্টয়ের কোন এক ইমামের নির্দিষ্টভাবে তাকলীদ করা অপরিহার্য। উল্লেখিত কারণে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর উলামায়ে-কিরামের যুগে " তাকলীদে মুতলাকের " অনুমতি রহিত হয়ে তাকলীদে শাখসী তথা চার ইমামের মধ্য হতে কোন এক ইমামের অনুসরণ (তাকলীদ) ওয়াজিব হওয়ার উপর ইজমা সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে, এই চার মাযহাবের অনুসারীগণ সকলেই "আহলে হক" এবং আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত।

বিশেষ নিবন্ধ

মুহাম্মাদ (সাঃ)-ই পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকারের প্রথম প্রবক্তা

উম্মে সালিম সালমা

মানবাধিকার সম্পর্কে পশ্চিমা দেশের প্রায় সকল আইনবিদদের বিশ্বাস, মানবাধিকার হল বর্তমান কালের ধারণা। তাদের দাবী ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ মানবাধিকারের ধারণার আন্তজাতিকরণ করছে। এবং ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্রণীত সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র মানবাধিকারকে সার্বজনীন মানবাধিকার কি আসলেই বর্তমানকালের ধারণা? এর পূর্বে কি পৃথিবীর মানুষ সার্বজনীন মানবাধিকারের ধারণার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেনি? সমাজে, রাষ্ট্রে, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এর সফল বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করেনি? অবশ্যই করেছে আমরা যদি আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পিছনে ফিরে তাকায় তাহলে দেখতে পাব যে, সর্বপ্রথম সার্বজনীন বা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ধারণা দিয়েছেন এবং মানবাধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে একমাত্র ইসলাম ও আমাদের নবী মুহাম্মাদে আরাবী (সাঃ) আর মুহাম্মাদে আরাবী (সাঃ) আর আমাদের নবীই ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবদরদী।

পশ্চিমা আইন বিদরা আদর্শিকভাবে ইসলাম বিরোধী। তাই মানবাধিকার আইনকে আধুনিক কালের বলে চালিয়ে দিয়ে তারা এক্ষেত্রে ইসলাম ও মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অবদানকে অস্বীকার করতে চাইছেন।

ইসলামে যে সফল মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে এগুলো পূর্ণাঙ্গ, সার্বজনীন,শাশ্বত ও চিরন্তন, যেগুলো স্বয়ং মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের প্রদান করেছেন। পৃথিবীর কোন অপশক্তি সেগুলো কখনও রহিত করতে পারবেনা, হরণ করতে পারবেনা। ইসলাম কোন ভ্রান্ত বা অপূর্ণাঙ্গ মতবাদ নয়। আর মানুষের মঙ্গলের ব্যাপারে আল্লাহ্র চেয়ে অধিক চিন্তা কেউ করতে পারেনা। ইসলাম ধর্ম-বর্ণ জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার দিতে কুন্ঠাবোধ করেনি। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)মানবাধিকারের পূর্ণাঙ্গ-চিরন্তনরূপরেখা মানবজাতির সামনে পেশ করেছেন। দিশেহারা অসহায় নির্যাতিত নিপীড়িত মানব জাতির মুক্তি কল্পে তিনি সকল মানুষকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপণ করে গেছেন যা পৃথিবীতে কখনও হয়নি এবং হবে বলে আশা করা যায়না।

ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) তার জীবনব্যাপী সংগ্রাম করে সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ইসলামে মানবাধিকারের ধারণা শুধু কোন ঘোষণার মধ্যে সীমিত নয়, বরং এটি প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষকে তার পূর্ণাঙ্গ অধিকারের ঘোষণা প্রদান করেই ইসলাম থেমে থাকেনি, বরং প্রত্যেকটি অধিকার কার্যকর করে মানব জাতিকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। জাতিসংঘ এবং পাশ্চাত্য সমাজের ন্যায় মানবাধিকারেরকে ইসলাম পদদলিত করেনি, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে কোনরূপ প্রতারণার আশ্রয় নেয়নি। বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি এসে পাশ্চাত্য জগত মানবাধিকর সম্পর্কে কিছু বুলি আওড়াতে শুরু করলো ও কার্যতঃ এবক্তব্য সত্যের অপালাপ-বিকৃতি ছাড়া কিছুই না।

মানবাধিকারের পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছে ইসলাম। মানবাধিকারের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করেছেন ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং এতে কোনরূপ প্রতারণা ছিলনা থাকতে পারেনা। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মানবজাতির সত্যিকার মুক্তির লক্ষ্যে সত্যিকার অর্থে সকল মানুষকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে য সমস্ত মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার প্রদান করেন তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ-রেখা তুলে ধরছি।

১.জীবনের নিরাপত্তা লাভের অধিকার ঃ জীবন ধারন বা জীবনের নিরাপত্তা লাভের অধিকার মানুষের অন্য সকল অধিকারের মূল। কেননা এ ছাড়া অন্য সকল অধিকার অর্থহীন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করেছে ইসলাম। রাজনৈতিক বা অন্য কোন মতামত, সমাজিক বা রাষ্ট্রীয় অবস্থান কোন কারণেই কেউ অপর মানুষের এ মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আল- কোরআনের ফরমানঃ "নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করল, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে প্রাণে রক্ষা করল। যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তথা আইনের যথাযত পদ্ধতি (Due process of law) ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করাকে ইসলাম নিষেধ করেছে। উপযুক্ত আদালতের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে কারও প্রাণ হরণ করা ইসলামে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ) এর বহুসংখ্যক হাদীসও রয়েছে। বলা হয়েছেঃ "অমুসলিম জিম্মিকে যদি কেউ হত্যা করে তাহলে সে বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না। বিদায় হজ্জের ভাষণে প্রিয়নবী (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ " হে লোকসকল! পরস্পরের জান-মাল ও উজ্জত আবরুর উপর হস্তক্ষেপ তোমাদের জন্য হারাম করা হল।"

২. আইনের দৃষ্টিতে সমতা ঃ (Equalith before law) আইনের দৃষ্টিতে সমতা হল আইনের

শাসন এবং মানুষের স্বাধীনতা সংক্রান্ত অধিকারের মূলমন্ত্র। প্রিয়নবী (সাঃ) সকল মানুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা প্রভৃতি কোন কারণে কারও প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূলমন্ত্র হল সকল মানুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ এ ধারণার উপর। প্রিয়নবী (সাঃ) মনবজাতির সামনে আল্লাহর ফরমান পেশ করেন ঃ "হে মানবজাতি । আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যেন তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার।" প্রিয়নবী (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ "কোন আরবের প্রধান্য নেই অনারবের উপর, কোন অনারবের প্রাধান্য নেই কৃষ্ণাঙ্গদের উপর, কিংবা কৃষ্ণাঙ্গদের প্রধান্য নেই শ্বেতাঙ্গদের উপর। বরং তোমরা সকলে আদমের সন্তান এবং আদমকে সৃস্টি করা হয় মাটি থেকে। ইসলাম সকল মানুষেকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সকলের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে, আইনের দৃষ্টিতে পুরোপুরি পক্ষপাতহীন করেছে। চুরির অপরাধে সম্ভ্রান্ত বংশীয় জনৈকা ফাতেমা অভিযুক্ত হলে কয়েকজন সাহাবা নবীজীকে অনুরোধ করলেন সম্ভ্রান্ত বংশের এ মহিলাকে যেন কম শাস্তি প্রদান করা হয়। নবীজী (সাঃ) এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে সাহাবাদের হুশিয়ার করে দেন, তোমাদের পূর্বে বহুজাতি ধ্বংস হয়েছে এরকম পক্ষপাতমূলক বিচারের জন্য। প্রিয়নবী (সাঃ) ইরশাদ করেন-" আজ যদি আমার মেয়ে ফাতিমাও চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হত, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তারও হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিতাম। আইনের দৃষ্টিতে সমতার এ বিরল দৃষ্টান্ত পৃথিবীতেক প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। তবে ইসলাম অবশ্য একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একে অপরের উপর প্রধান্যকে স্বীকার করে। প্রিয়নবী (সাঃ) মানবজাতির সামনে আল্লাহ্‌র ফরমান পেশ করেন- " নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেযগার। প্রত্যেকের জন্য কৃতকর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যাতে আল্লাহ্ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন। বস্তুতঃ তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। আইনের দৃষ্টিতে সমতা নীতিটি কার্যকর করার পাশাপাশি একে অপরের উপর প্রধান্য সম্পর্কিত উল্লিখিত মানদন্ডের মাধ্যমে ইসলাম মূলতঃ প্রত্যেক মানুষকে সৎকর্মে প্রতিযোগী করে সর্বাঙ্গীন সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

৩. মান-মর্যাদার নিরাপত্তাঃ শুধু জীবনের নিরাপত্তা নয়, বরং মান-মর্যাদার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদান করেন। মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত-এর মর্যদা দেয়া হয়েছে। মানুষ পৃথিবীতে আল্লহ্‌র প্রতিনিধি এবং এ মানুষ সম্পর্কে ইসলামের ভাষ্য ঃ " নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষকে সর্বোত্তম আদর্শরূপে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মান-মর্যাদার নিশ্চয়তা প্রদান করতে যেয়ে প্রিয়নবী (সাঃ) আল্লাহ্‌র বাণী পেশ করেনঃ "হে ঈমানদারগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করোনা এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার আপন মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা তা অপছন্দ কর।"

ইসলাম এভাবে সকল মানুষের মান-মর্যাদার নিরাপত্তা প্রদান করেছে। উল্লেখ্য, নারীর মান-মর্যদা সংরক্ষণে ইসলাম এবং তার নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। আল-কুরআনের বাণী তিনি পেশ করেন-" যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি । " যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহণ করে। রাসূলে করীম (সাঃ) তাঁর অসংখ্য হাদীসেও মানুষকে অহেতুক মারধর, অবমাননা ও অপমান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

৪. সম্পত্তির অধিকারঃ প্রিয়নবী (সাঃ) আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেই সকল মানুষের সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা একটি সুশীল সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র এবং সৌহার্দময় বিশ্ব গড়ার রূপরেখার বাস্তবায়ন করে গেছেন। আল্লাহ্‌র ফরমান তিনি বিশ্ববাসীকে শোনান -' তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগনের সম্পদের কিয়দংশ জেনে শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিওনা।"

নবীজী (সাঃ) ঘোষণা করেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে যেয়ে নিহত হয় সে শহীদ।"

৫. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ঃ রাসূলে আকরাম (সাঃ) সকল মানুষকে মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। শুধু তাই নয়, ভয়-ভীতি এবং পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে সত্য প্রকাশ করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব বটে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ " আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নরী এক অপরের সহা ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে।..."

আল্লাহ্ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করেন না। তবে কারো প্রতি যুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ্ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ।"

নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ " সবচেয়ে সম্মানজনক জিহাদ হল অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য বলা।"

সুতরাং ইসলাম কেবল মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাই

দান করেনি, বরং এটিকে একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হিসেবেও গণ্য করে।

৬.সংগঠনের অধিকার ঃ সৎ উদ্দেশ্যে সংগঠিত হওয়ার মৌলিক অধিকার প্রিয়নবী (সাঃ) প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তবে তা অবশ্যই কোন অসৎ উদ্দেশ্য হবে না। রাসূলে করীম (সাঃ) মানবজাতির সামনে আল্লাহ্‌র হুঁশিয়ারী পেশ করেনঃ " আর তাদের মত হয়োনা, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরেও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর আযাব।

৭. চলাফেরার স্বাধীনতা ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সকল মানুষকে এ মৌলিক অধিকারটি প্রদান করেন। আল্লাহ্‌র ফরমান তিনি মানবজাতির সামনে পেশ করেনঃ " তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর।"

৮. ন্যায়বিচার লাভের অধিকার ঃ জাতি-ধর্ম-বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের ন্যায়বিচার লাভের অধিকার রাসূলে করীম (সাঃ) প্রদান করেন। এক্ষেত্রে কুরআনী বক্তব্যঃ " আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ কর। তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। " আমি (নবী) তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি।"

৯. ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ঃ প্রিয়নবী (সাঃ) প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। ইসলামে আইনের সুস্পষ্ট ধিান ছাড়া কাউকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার, আটক বা বল প্রয়োগ করা নিষেধ এবং একের দায় অন্যের উপর চাপানো অবৈধ।

১০. ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ প্রিয়নবী (সাঃ) সকল ধর্মের মানুষকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। ধর্মের ব্যাপারে ইসলাম কারো প্রতি জবরদস্তি করে না। মদীনা নগররাষ্ট্রে কোন অমুসলমানের প্রতি ধর্মীয় ব্যাপারে জবরদস্তিমূলক আচরণ করা হয়েছে এ ধরণের তথ্য প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না।

১১. ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার ঃ ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ইসলঅমী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করতে পারে। নবীজী (সাঃ) এদেরকে মুসলমানদের আমানত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১২.অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার ঃ রাসূলে করীম (সাঃ) তাঁর পবিত্র জীবনে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন, তা হল ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ম-গোত্র-বর্ণ ইত্যাদি বিদ্বেষের কারণে কোন ব্যক্তির মৌলিক অর্থনৈতিক চাহিদা যেমন-অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান হরণ করা যায় না। নবীজী রাষ্ট্রের সকল মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩. রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন, সে রাষ্ট্রের কার্যক্রম চলত পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশ গ্রহণকে মৌলিক অধিকার হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ফরমান তিনি পেশ করেনঃ "যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করেন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।"

১৪. শিক্ষার অধিকার ঃ নবীজী তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানব সমাজের প্রতিটি সদস্যকে শিক্ষার অধিকার প্রদান করেছেন বললে বোধ হয় ঠিক বলা হবেনা, বরং তিনি শিক্ষাকে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করে মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপণ করেন।

১৫. দাস-দাসীর অধিকার ঃ মানব ইতিহাসে মানবদরুদী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দাস-দাসীদেরকে পূর্ণাঙ্গ মানুষের অধিকার প্রদান করেন। তিনি দাস-দাসীদেরকে পূর্ণাঙ্গ মানুষের অধিকার প্রদান করেন। তিনি দাসপ্রথাকে সমূলে উচ্ছেদ করেন। খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) -এর সঙ্গে তাঁর শুভ পরিণয়ের সময় আরবের তৎকালীন ঐতিহ্য অনুযায়ী যায়েদকে দাস হিসেবে প্রদান করা হয়। কিন্তু নবীজী (সাঃ) তাঁকে মুক্ত করে দেন। অবশ্য রাসূলে করীম (সাঃ) এর সাহচর্য ছেড়ে যায়েদ তাঁর নিজের পিতার সঙ্গে যেতে না চাইলে সারাজীবন নবীজী (সাঃ) তাকে মর্যাদার আসনে রাখেন যে, সকলে যায়েদ (রাঃ) কে নবীজীর ছেলে মনে করতেন।

১৬. নারীদের বিশেষ অধিকার ঃ নারীদের তিনি সর্বাঙ্গীন সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। নারীদেরকে তিনি পুরুষদের সঙ্গে কেবল সমঅধিকার নয়, বরং মান-মর্যাদার দিক থেকে তাদেরকে পুরুষদের উপরে স্থান দেন। নারীদেরকে তিনি সকল অধিকার প্রদান করেন যার মধ্যে মোহরের অধিকার প্রদান করেন, ভরণ-পোষণের অধিকার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মানবাধিকার বাস্তবায়ন ঃ অধিকার শুধু প্রদান করলেই হয় না; বরং তা বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক। অধিকার প্রদান করে তার বাস্তবায়ন না করা মারাত্মক প্রতারণার শামিল। নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানব জাতিকে সকল প্রয়োজনীয় অধিকার শুধু প্রদান করেননি, বরং সবকটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়ন করেন। উপরন্ত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি অপরের সঙ্গে প্রতারণা করে এবং অন্যের অধিকার হরণ করে, তাহলে পরকালে তাকে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

প্রথম দিনের সূর্য

শফিউল্লাহ্ কোরাইশী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মৃত্যুর ছোঁয়ায় নিথর ভর দুপুরের বস্তি নিযামুদ্দিন।

মাথার ওপর সূর্য। মনে হয় আকাশ থেকে খসে পড়বে পাপীদের ওপর। প্রচন্ড রাগে ফেটে পড়ছে সে। পরম প্রভুর ক্রোধ যেন তার ভেতর ঢুকে পড়েছে। সে নেমে আসবে এখনি মাথার ওপর। চিরে ফেড়ে যাবে মাথার খুলি। গড়িয়ে পড়বে মগজ আর ঘিলু। বেয়ে নামছে কানের লতি, গাল বেয়ে।

বেলা বাড়লো ।

সহসা.....

কোথা থেকে এক টুকরো মেঘ এসে পড়লো সূর্যের ডান পাশে। একটু পরেই আর একটি এসে ভিড়লো তার পাশে। তারপর এক নাগারে, খানিক পর পর মেঘ এসে এসে ঘিরে ফেললো সূর্যকে। আরও খানিক পর তারা এক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো সূর্যের বুকের ওপর। চেপে বসলো প্রাণপনে। কমে গেল সূর্যের তেজ। মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল গোটা আকাশ।

সূর্যের প্রচন্ড দাপটে ঝলসে যাওয়া প্রকৃতি একটু যেন প্রাণ পেল ফের।

কিসের বেদনায় বিধুর হলো নীলাকাশ। নির্মম যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে কালো ধোঁয়া, চুলো ছাড়ে তার কালো নিঃশ্বাস, চোখে পড়ে না ঝকঝকে নীলা আকাশ। নিযামুদ্দিনের আকাশ এখন রুপ নিয়েছে শ্লেট বর্ণের। ছাইমাখা।

হঠাৎ ---------

বইতে শুরু করলো হিমেল হাওয়া। প্রাণ জুড়ানো। ঝির ঝির ঝির ঝির হাওয়া। পাতারা শব্দ তুললো। কী নিয়ে যেন ফিস ফিস করছে গাছপালা, তরুলতা।

হাওয়ায় অচেনা আওয়াজ! আওয়াজের ভেতরে অন্য আওয়াজ!

উপরে-

আকাশ জোড়া মেঘ।

এ যেন অন্য মেঘ। টুকরো মেঘেরা লেগেছে গায়ে গায়ে। ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে সোনালী আলো। এ আলোও যেন অন্য আলো । এই মেঘের ভেতর যে মেঘ –সে হাসছে। এ আলোর ভেতর যে আলো –সেই অন্য আলো হাসছে। রহস্যময় মুচকি হাসি।

কেন?

তারা কী শুনতে পেয়েছে কোনও আগমনী বার্তা? সোনালী সংবাদ? নতুনের? আনন্দের? শান্তির?

হাজার বছর পর আজ আবার কি পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়বে অমল ধবল ঝর্ণাধারা? অনন্ত কালোরাত্রি শেষে পূবের আকাশে কি ফুটবে সোনালী সূর্যচ্ছটা? সেই কবে আচমকা পাথরে হয়ে যাওয়া সাউথ ডাকোটার রহস্যময় পেট্রোয়াড ফরেস্টের পাথুরে কীট পতঙ্গ, গাছ-পালা আবার কি কোনো হিরন্ময় পরশ পাথরের ছোঁয়ায় ফিরে পেল প্রাণ?

এ প্রাণের সাড়া সুতীব্রভাবে অনুভব করলেন নিযামুদ্দিনের বাঙলাওয়ালী মসজিদের আধো আলো আঁধারির ভেতর ঠান্ডা মেঝেয় বসে থাকা বিশাল পাগড়ি পরিহিত গভীর ধ্যানে তন্ময় প্রাচীন (মনের দিকদিয়ে) বেঁটে খাটো মানুষটি। প্রচন্ড আধ্যাত্মিক ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠলেন তিনি।

তার রহস্য বুঝলেন না কিছু।

তিনি চিন্তা করছিলেন মানুষের কথা ।

নবী আসবেনা । আসবেন না পয়গম্বর বা রাসূল আর কেউ। পথহারা মানুষকে তাহলে কে পথ দেখাবে? কিভাবে?

নবী আলাইহিমুস সালামদের, সাহাবা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুদের যে প্রচন্ড আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল তা এখন কোথায়?

নেই!

তাহলে উপায়?

পথটা কি? কিভাবে?

ভাবছেন। তন্ময়।

তখনই অনুভব করলেন তাঁর বোজা চোখের সামনে কী যেন খুলে যেতে চাইছে।

কী?! (চলবে.....)

পরকীয়ার পরিণতি

আইয়ুব বিন তালিব

মেয়েটির জন্ম হয়েছে মাত্র দশ দিন হলো। প্রথিবীর আলো -বাতাস এখনো ভাল করে দেখা হয়নি। ইতোমধ্যে তার ভাগ্যাকাশে ঘনকালো মেঘ জমে ওঠে। রাতের শেষ প্রহরে তার জীবনে প্রলয়ংকারী ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। ঋতু বৈচিত্রের দেশ হলেও মাঘের সেই হিমেল রাতে টর্নেডো। বাইরে বরফ জমানো শীত। এক চিলতে কাপড় গায়ে মায়ের কম্বলের নিচেই মেয়েটি নিদ্রা বিভোর। খুব সুদর্শনা শিশু। যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। জ্বলে উঠলে পতঙ্গেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে মরবে ঠিকই।

বাবাও ঘুমের ঘোরে কাতর। চারদিকে নিথর-নিস্তব্ধ। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। ঝড়-বৃষ্টি থেমেছে অনেক আগেই। তবু ঝিঁ-ঝিঁ পোকা, ফড়িং, ব্যাঙ ইত্যাদির আনাগোনাও খুব একটা না। বন্যরাও শীত ঠেলে বের হবার সাহস পাচ্ছেনা। আলতো করে কম্বল ছেড়ে উঠে বসে তার গর্ভধারিনী। ভালকরে স্বামী সন্তানের মুখ দেখে নেয়,শেষ বারের মত। রা-শব্দ নেই। মন্থর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলে।

সন্ধরাতে স্বামীর অনুপস্থিতিতে সব গুছিয়ে রেখেছিল কিন্তু অনবরত চেঁচামেচিতে গা-ছাড়া করতে পারেনি। নয় বেরিয়ে পড়ত তখনি। বাধা দেওয়ার কেউ ছিলনা। স্বল্পতেই গন্তব্যে পৌছা যেত। এত ভয়, শীত কিছুই আঁচ করতে পারতনা।

ঘটনার প্রায় দেড় বছর আগে তার বিয়ে হয়। উচ্চ বংশের এক শিক্ষিত মার্জিত, সুদর্শন, বিত্তশালী যুবকের কাছে। কন্যা হয়েছে দিন দশেক। তা হয়েছে কি? সেতো আর চায়নি, হয়েছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে। অভিভাবকরা জুলুম করেছে। প্রেম-ভালবাসা-সুখ গলাটিপে হত্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু কান্ডজ্ঞান বিচার-বিবেচনা থাকতে তা মরতে দেয়া যায়না। আজীবন বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে অনেক। স্বামী-কন্যা-সংসার নিয়ে ভেবে কাজ নেই। অত সময় নেই তার। নিজের অভিসারই বড়। অগত্যা এখন বেরুতে হবেই। বিপদাপদ যা হবার হবে। বিয়ের এই গেল সময়ে স্বামীর সাথে তেমন ঝগড়া-ঝাটি হয়নি। মনোমালিন্য হয়নি কারো সাথে। হয়নি দর কষাকষিও। কিন্তু সত্যি বলতে কি

চৌম্বকের আকর্ষণ সুপ্ত থাকলেও নিশ্চয় তা মিথ্যে নয়। তাই স্বামীর ঘর তাকে ছাড়তে হবেই। পেছন ফিরে দেখে আরেকবার। মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে জীবিত মাসুম দুগ্ধপোষ্য শিশুটি ঘুমিয়ে আছে।

স্বগৌরবে কদম বাড়ায় তার গর্ভধারণী। কাঁপেনি এতটুকুও। নবজাতকের প্রতি সামান্য মমত্ববোধ হয়নি। জাগেনি মাতৃত্বের কোন অনুভূতি। নিস্পাপ ফুলটি ছুঁড়ে মারে ডোবার জলে-নর্দমায়। কলঙ্কিত করে তার ভবিষ্যত। সহসাই ফুটফুটে জ্যোৎস্না, ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে যায়।

ভালোয়-ভালোয় নিরাপদ দূরত্বে কেটে পড়ে। মাঝে বিরতিও দেয়নি। কন্যাকে দশমাস দশদিন পেটে ধরে গর্ভধারিনী হয়েছে বটে; মা হতে পারেনি। পেটে ধরলেই কি আর মা হওয়া যায়? ড্রেনে, ডোবায়, ডাষ্টবিনে, পথ-প্রান্তরে জঙ্গলে পাওয়া নবজাতকেরও গর্ভধারিনী আছে। এদের মাতৃত্ববোধ ,মমত্ববোধ থাকলে তো পিছু টলবেনা!

ক্ষণকাল পর তুরাগের নিকটস্থ কোন শহরে তার বেয়াড়া জীবনের ব্যাপৃতি ঘটে। যখন যেখানে যেভাবে ইচ্ছে চলে যায়। যাত্রা-সিনেমা, থিয়েটার দেখে মজা করে। শহরের অলিতে-গলিতে ঘুরে। কৃত্রিম-অকৃত্রিম সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে। নিত্য-নতুন মৌ-লোভীদের বাহুতলে যায়। আয়েশ মেটায়, নানা রকম সুবিধাদি ভোগ করে। কিছু করার নেই। উপায় তো ঐ

একটাই। যে প্ররোচনায় ঘর ছেড়েছিল, সে আশায় গুড়ে বালি পড়লে পাড়া গাঁয়েই দেহ প্রসারিত করেছে। রূপ-জৌলসে ভরা যৌবন মোহে মাথা খেয়েছে অনেকে বটে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার লাথি মেরেছে, থুথু ফেলেছে।

একদিন জনৈক পথচারী বিলের মাঝপথে যাচ্ছিল ছোট ঝোপের ভেতর থেকে আসা পরিচিত কণ্ঠের গোংগানি কর্ণছাড়া করতে পারেননি। এগিয়ে গেলেন উৎকণ্ঠায়, থমকে দাড়ালেন সংকোচে। দেহ অবশ হয়ে গেল। ক্ষত-বিক্ষত এই মেয়েটি তারই স্ত্রীর প্রতিবেশী। করুণা করলেন তাকে। অতপর দেহ নিলামে দিয়েও মহিলাটির ঠাঁই হলনা, পাড়া-গাঁয়ে। শরণার্থী শিবিরের সন্ধানে সে অস্থির। এক সময় তুরাগের কাছাকাছি এসে অবস্থান নেয়।

বিপন্ন জীবন, ক্লান্ত প্রহর। বাঁচতে হবে। হোক না সে বন্দীশালায়। তবু আশ্রম,পূনর্বাসন। সহসা এক বুড়ো খদ্দেরের পদধ্বনী। বড় উল্লসিত সে, ভাবে এইতো প্রতিক্ষিত সুখ, অনাবিল আনন্দ ফোয়ারা, ক্লান্ত তনুতে উচ্ছাসের ঢেউ খেলে যায় আরো বিদঘুটে আঁধারে। একি তার সৌভাগ্য না দূর্ভাগ্য ছিল ঠিক বলা যায়না। এখন সে কয়েক জনের গর্ভধারিনী। কিন্তু আজোও সেই কয়লা একই ছাই।

মুহসেনা নারীর সুখের ঘরে আগুন জ্বলুক, গৃহছাড়া হোক সে । কিংবা অবোধ, নিস্পাপ শিশুর ভবিষ্যত অনিশ্চিত থাক বা বিবাহযোগ্য ছেলে-মেয়ের জীবন কলঙ্কিত হোক তাতে ভ্রাম্যমান দেহপ্রসারিণীর তো কিছু খোয়া যায়না।

এই অবৈধ যৌন-সংস্বর্গ, প্রেম বা ভালবাসা নয়। নিতান্তই এক ধ্বংস লীলা মাত্র। অবশ্য কেউ কেউ যুবক-যুবতির অবাধে মাখামাখিকে পবিত্র প্রেম-ভালবাসা বলে আখ্যা দেয়। রূপকথার লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদের উপামা টেনে ওসবের বৈধতা দেয়ার প্রয়াস চালায়। নিশ্চিত এরা সঠিক শিক্ষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা বিবর্জিত। বর্বর প্রজাতির মানব-পশু। নষ্ঠাপল্লীতে যাতায়াত প্রেষ্টিজ কন্সান্ট-তাই!

তাছাড়াও দু'হাজার সনের প্রায় দৈনিকেই পরপর ছাপা হয়– মীরপুরস্থ মনিপুরের লোমহর্ষক কাহিনী। স্বগৌরবে পুলিশে জবান -বন্দি দিয়েছে ঐ দু'সন্তানের গর্ভধারিণী। –দেবরের সাথে প্রবৃত্তি চরিতার্থকালে সাত-আট বছরের দু'সন্তান দেখে ফেলায় দু'টি উদরের ছেলেকেই নিজ হাতে গলাটিপে হত্যা করে।" এই দেবর-ভাবীর সম্পর্ক ছিল ছোট থেকেই। বড় ভগ্নির অকাল মৃত্যুতে বাধ্য হয়ে দুলাভাইকে বিয়ে করতে হয়েছিল। নপুংসক স্বামীটাও ছাড় দিয়েছিল প্রচুর। যার ভয়ঙ্কর পরিণাম এই নিস্পাপ শিশুদ্বয়ের বলি।

পাঠক! ঘটনা উপজীব্য নয়। লিখব ক'টা? সমাজের আনাচে কানাচে পরকিয়ার অসংখ্য বর্বর দৃশ্য রয়েছে। দৃষ্টির আড়ালেও রয়েছে বেশ।

ফলশ্রুতিতে অনেকেই দেউলিয়া, যাযাবর হচ্ছে। আত্মহুতি দিচ্ছে কেউ কেউ। আবার কেউবা সন্যাসির পথ বেছে নিচ্ছে। উন্মাদ মাতালের সংখ্যাও কম নয়। ফের বিচ্ছিরি ডায়ালগ দিচ্ছে – "শরৎ চন্দ্রের দেবদাস পড়নি; পার্বতীর জন্য দেবদাস কিভাবে আত্মহুতি দিয়েছে?" তার মত আমিও ....। কেউবা তথাকথিত প্রেমিকাকে খুন করছে। কিংবা এসিডে ঝলছে দিচ্ছে দেহ-মুখ। আবার কেউ অপর মৌ-লোভীকেও খুন করছে।

২০০১ ইং, মার্চে ঢাকার কেন্দ্রিয় কারাগারে ক'জনার সাথে পরিচয়। তাদের একজন– মৌ-লোভীকে খুন করেছে। একজন এসিডে ঝলসে দিয়েছে কথিত প্রেমাষ্পদের সারা অবয়ব্ অপরজন ভাবীর প্ররোচনায় খোদ মেয়েটাকেই ওপারে পাঠিয়েছে। কি জঘন্য! অমনবিক। লোমহর্ষক! এছাড়াও গোপন অভিসার মিলছে-চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো ভাই-বোন, প্রতিবেশী, পাশের ফ্লাটের তনয়-তন্বীরা। আর শালার বৌ ও শালিকারা তো আজকাল উপপত্নি হিসেবে ব্যবহৃত। অনুরূপ সুযোগ-সন্ধানী যুব-যুবাদের সঠিক পরিসংখ্যান কে জানে? বড় কুৎসিৎ, কদাকার!

বলা বাহুল্য যে, দেবর-ননদের জন্য ভাবীর প্রচেষ্টা থাকে নিরলস। বন্ধ-বান্ধব ও খয়ের খাঁদের সহযোগিতাও অনস্বীকার্য। সুবিধা পেলে করবেনা কেন? কথায় আছে– টাকার গন্ধে মুরদাও জীবীত হয়ে যায়।"

কিন্তু সাবধান! কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– " {(তোমরা বিয়ে করো) এতাবস্থায় যে; তারা সেচ্ছয় পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য

নয়, এবং গোপন সম্পর্ককারীও (পরকীয়ায় জড়িত) নয়।"}

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণী উভয়কেই শত দোররা মারো। তোমরা পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করোনা।"

অনুরূপভাবে হাদীসেও মাফহুমে মুখলিফ দ্বারাও এ কথাই প্রতিয়মান হয় যে, মন্দ কাজের পথ নির্দেশনা ঐ কাজ করারই নামান্তর।

আরোও অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। কাজেই পাত্র-পাত্রীর সাথে ভাবী এবং যোগসূত্র-রক্ষাকারীরাও হুঁসিয়ার! অবশ্যই প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অন্তত পৈত্রিক সূত্রেও মুসলমান হোন, আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) পরোকাল তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়ের ঈমান থাকে, তবে এহেন পাপ কাজ বর্জন করা অসম্ভব কিছু নয়।

বিশুদ্ধ বোখারী, মুসলিম, মিশকাতসহ অনেকক হাদীস গ্রন্থেই রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তি বিপদে পড়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় ফাঁতে পড়ে যায়। অগত্যা এক পাথর পড়ে গুহা-দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে, আজ স্রষ্টার অপার করুণা ছাড়া মুক্তির কোন উপায় নেই। কাজেই তারা নিজস্ব নেক কাজের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকে। তন্মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বলে– হে মহান করুণাময়! আমি আপন চাচাতো বোনকে খুব ভালবাসতাম। তাহার ভরা যৌবন-মোহে আমি তাকে ভোগ করার ইচ্ছা করলাম। সে আমাকে এক হাজার দিনার প্রদানের শর্তারোপ করলো। অনেক কষ্টে তা যোগাড় করে তার হাতে দিলাম। এবং ভোগ করতে চাইলাম। সে অনিচ্ছা সত্যেও আমাকে ভোগ করার সম্মতি দিল। অতঃপর যখন সে বলল– হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আল্লাহকে কে ভয় করো। আমার কুমারিত্ব নষ্ট করোনা। সতিত্ব হরণ করোনা। আমি তাকে ছেড়ে চলে এলাম। –প্রভূ হে! তুমি যদি জান, একাজটি আমি তোমার জন্য করেছি তবে এই আকস্মিক বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করো। অতঃপর গুহার মুখ থেকে পাথরটি কিয়দাংশ সরে আসে। এভাবে তাদের নেক আমলের উসিলায় সেদিন তারা মুক্ত হয়। বোধগম্যযে, নূন্যতম প্রভু ভীতিই সেই ছেলে-মেয়েকে অবৈধ যৌনতা চরিতার্থ থেকে রক্ষা করেছে। ঐ নারীর কাছে তার স্বতীত্ব ছিল বড় মূল্যবান। আর যার তার সাথে অবাধে মাখা-মাখি কখনো সত্বী নারীরা পারে না। পারে ভ্রাম্যমান দেহপ্রসারিণীরা!

কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে– "তোমরা অবৈধ যৌন সংস্বর্গের কাছেও যেওনা। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ মন্দ পথ। তদুপরি কেউ যদি ভাবে যদি আমি সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, ইরান কিংবা ইউরোপ-আফ্রিকার কোন রাষ্ট্রের বাসিন্দা হতাম! তবে ঐ নষ্টের যথোপযুক্ত জবাব হচ্ছে–দূর, গাধা কোথাকার! বল-আমি যদি পাঠা হতাম! পশু হতাম! তাহলে পথ-ঘাট লোকালয়-জঙ্গল কিছুউ ভাবতে হতোনা। ধর্ম-কর্মেরও প্রশ্ন উঠতনা।

একটি কথা না বললেই নয়– আমি এক সফরে গাজীপুরের অন্তর্গত কালিগঞ্জ-কাপাসিয়া রোডে বাসে বসে আছি, ছাড়ার অপেক্ষায়। একটানা দীর্ঘ-জার্নীর পর বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল, হঠাৎ কঁচি মুখের একটি বিচ্ছিরি কথা আমার ভেতরে নিতান্তই প্রতিধ্বনী সৃষ্টি করে। বাহিরে তাকিয়ে দু'জন লোক ও সাত-আট বছরের এক কিশেরকে দেখলাম। সে কথার প্রেক্ষিতে আবারো ঐ বিচ্ছিরি বাক্যটি বলল–" ছিনাল গেছে বিনালে।" আঞ্চলিক এই কথাটির ব্যাখ্যা দিতেও ঘৃনা হচ্ছে। তবে এতটুকু যে, ঐ শিশুটি নেহায়েত ক্ষোভে দুঃখে, ঘৃনায় তার গর্ভধারিনীকেই এই কটাক্ষ করেছে।

পরকিয়ায় জড়ায় দেহপ্রসারিণী, ব্যভিচারিণী আর পোস্তায় কত সত্বী-সাধ্বী, দু'চার সন্তানের মা। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু কিশোর। এক নারী কত পুরুষকে চরিত্রহীন বানাতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। আহ! সত্যি বড় বিচিত্র এই জাতি, মানুষ!

আমার বিশ্বাস-নিশ্চয় কেউ চায় না যে, তার সন্তান কিংবা অপর কেউ উক্ত খেতাবে ভূষিত করুক। বিশেষিত করুক এ ধরণের কোন মন্দ গুনে। বরং উপরোক্ত খেতাবে রীতিমত সকলেরই গা জ্বলে বৈকি? তাই বলব– এসো ইসলামের ছায়াতলে, চির শান্তির পথে। ছাড়ো ফ্রিমাইন্ড, বল্গাহীনতা ও লাগামহীতার খোঁড়া যুক্তি। ইসলাম ওসবের তীব্র নিন্দা করে। কঠিন শাস্তির হুঁসিয়ারী দেয়। জেনে রেখো– তার (আল্লাহ্‌র) শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, বড় কঠিন।

উপমহাদেশের মুসলিম শাসক মোগলদের স্থাপত্য

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান

১৫২৬ থেকে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ উপমহাদেশে মোগল সম্রাটগণ শাসনকার্য পরিচালনা করে গেছেন। বাদশাহ বাবর যে মোগল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন সম্রাট বাহাদুর শাহর আমলে তার পরিসমাপ্তি ঘটে বলে ঐতিহাসিকগণ অভিমত প্রকাশ করেন।

উপমহাদেশে আফগানরা প্রায় তিনশ বছর রাজত্ব করেন। আফগানদের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাদশাহ বাবর এদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫২৬ থেকে ১৫৩০ পর্যন্ত মাত্র চার বছর তিনি দেশ শাসন করার সুযোগ পান। তার পুত্র সম্রাট হুমায়ন ১৫৩০-১৫৫৫ খ্রিটাব্দে দেশ পরিচালনা করে। হুমায়নের পুত্র আকবর ১৫৫৬-১৬০৫, আকবর পুত্র জাহাঙ্গীর ১৬০৫-১৬২৭, জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান ১৬২৭-১৬৫৮, শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজের ১৬৫৬-১৭০৭ এবং আওরঙ্গজেরের পরে বাহাদুর শাহ ১৭০৭ থেকে ১৭১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। পুরো মোগল বংশই ছিল খুব সংস্কৃতিমনা। তাই তাদের আমলে এ উপমহাদেশে অনেকগুলো যুগোত্তীর্ন স্থাপত্য কর্ম প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনগনের ব্যবহারের জন্যে ও কিছু কিছু স্থাপত্য নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐতিহাসিকগন বলেন মোগল যুগ ভারতে শিল্পি স্থাপত্যের ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায়। এ যুগে স্থাপত্য কীর্তিগুলো আজও দেশ ও জাতির গর্বের বিষয়। মোগল স্থাপত্যে বৈদেশিক প্রভাব রয়েছে বলে শরগুসন মন্তব্য করলেও হ্যাভেল তার মতবাদ খন্ডন করে বলেছেন, ভারতীয় শিল্পী ও স্থপতিরাই মোগল আমলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। জন মার্শাল এর মতে মোগল স্থাপত্যে কোন একটি বিশেষ ধরণের রীতি লক্ষ্যণীয় ছিলনা। সাম্রাজ্যের বিশালতার ফলে এক এক অঞ্চলে এক এক ধরণের স্থাপত্য রীতি গড়ে উঠেছিল। এছাড়া সম্রাটের ব্যাক্তিগত রুচির জন্যও স্থাপত্য নির্মাণনির্ভর করতো। আকবরের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় স্থাপত্যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে আকবরের রাজত্বে ভারতীয় স্থাপত্য সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় প্রভাবে গড়ে ওঠে এবং পারস্যিক প্রভাবের বিলুপ্তি ঘঠে। মোগল যুগের স্থাপত্য অলঙ্কারক কারুকার্যাদি ও সৌন্দয্যের জন্য বিখ্যাত। ভারতীয় স্থাপত্য সম্পর্কে বাদশাহ বাবর মোটেই ধারণা পোষণ করতেন না। প্রাসাদাদি নির্মাণের জন্যে তিনি কনস্ট্যান্টিনোপলের বিখ্যাত আল-বানিয়ান স্থপতিগণকে ভারতে আনতে একসময় মনস্থ করেছিলেন। অবশ্য পরে তিনি এই সংকল্প পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর আত্মচরিত থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রাসাদ ও দুর্গ সমূহ নির্মাণের জন্যে আগ্রায় ৬৮০ এবং সিক্রি ও গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে ১৪৯১ জন স্থপতি নিযুক্ত করেছিলেন। বাবর নির্মিত সৌধগুলোর মাঝে পানিপথের ' কাবুল বাস্ট' এবং আগ্রার সম্বলের জামে মসজিদ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও হুমায়ুন বেশ ক'টি সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। পারস্যিক রীতির অনুকরণে নির্মিত ফতেহবাদের জামে মসজিদ ও দিল্লির ' দিন পানহ' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

আকবরের রাজত্বকালে মোগল স্তাপত্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আকবরের আমলে পারস্যিক ও হিন্দু স্থাপত্য রীতির সম্পূর্ণ সংমিশ্রন পরিলক্ষিত হয়। মোগল স্থাপত্যশিল্পে 'মসজিদ', 'মকবারা' ও 'মোকাম' এই তিন 'ম' এর সমাবেশ ঘঠে। মকবারা বলতে বুঝায় সমাধি সৌধ আর মোকাম এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো প্রাসাদ। আকবরের আমলের স্থাপত্যশিল্পে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ লাল পাথরের বিশেষ ব্যবহার এবং দ্বিতীয়তঃ ইমারতের বৃহদায়তন। ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি হুমায়ুনের সমাধিসৌধের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন এবং আগাগোড়া লাল মর্মর পাথরে নির্মাণ করেন। আকবর আমলে নির্মিত সৌধগুলোর মধ্যে ফতেহপুর সিক্রি, যোধবাই-এর প্রাসাদ, ইবাদতখানা, বুলন্দ দরওয়াজা, জামে মসজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিক্রি সম্পর্কে লেনপুল মন্তব্য করেন – "Nothing sadder or more beautiful exist in India than deserted city, the silent witness of a vanished dream." ফারগুসন ফতেহপুর সিক্রিকে 'মহৎপ্রাণের প্রতিবিম্ব' বলে অভিহিত করেছেন। আকবরের নির্মিত প্রাসাদ ও সৌধ সংখ্যা ৫ হাজার। যার সবগুলোই লাল বর্ণের মর্মর পাথরে নির্মিত।

সিকেন্দ্রায় তার অপূর্ব সমাধি সৌধটির পরিকল্পনা তার জীবদ্দশাতেই প্রস্তুত হয়েছিল। তার আমলে সেলিম চিশতীর সমাধি সৌধ নির্মিত হয়। গুজরাটের পাঁচমহল ও এলাহাবাদের রাজপ্রাসাদও নির্মিত তার আমলেই। সম্রাট জাহাঙ্গীর এর আমলে আকবরের সমাধি সৌধ সিকেন্দ্রা, ইতিমাদ-দৌলার সমাধি সৌধ ও তার নিজের জন্য নির্মিত সমাধি সৌধের নাম উল্লেখ করা যায়। শ্বেত পাথরের ব্যবহার এ সময়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট।

পিতা আক্‌বরের মতো জাহাঙ্গীরের স্থাপত্যপ্রীতি তেমন ছিলনা বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন । তিন স্থাপত্যের পরির্বতে চিত্র- শিল্পের প্রতি বেশি অনুরাগী ছিলেন । নূরজাহান পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে ইতিমাদ-দৌলার সমাধিসৌধ নির্মাণ করতে চাইলে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাতে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেন । পাসিব্রাউন এর মতে-

"Itimad-Ud-daula expressed in every part of it the high aesthetic ideals that prevailed among the mughals at that time"

স্থাপত্য শিল্পে মোগল সম্রাটদের মধ্যে শাহজাহান ছিলেন অদ্বিতীয় । তার নিমির্ত স্থপত্য অলঙ্করিক কারুকার্য ও চিত্রাঙ্কনের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে । মোগল সম্রাদের মাঝে শাহজাহানকে স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক বলা হয় । তার সময় কালকে স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয় । তাঁর নির্মিত ভবনগুলো শুধু ভারতবর্ষে নয় গুণে মানে সারা পৃথিবীতে অতুলনীয়। আগ্রায়, দিল্লী, লাহোর, কাবুল, কাশ্মীর প্রভৃতি সকল স্থানেই তিনি প্রাসাদ ও সৌধ নির্মাণ করেন। এগুলো মাঝে দিল্লীর দেওয়ানই আম, দেওয়ানই খাস, জামে মসজিদ,মতি মসজিদ এবং তাজমহল সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি স্ত্রী মমতাজ মহলের কবরের উপর অবিনশ্বর এক প্রেমের অনিন্দ্য সুন্দর সৌধ যে তাজমহল নির্মাণ করেন তা শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে গণ্য। শিল্প-সৃষ্টির দিক থেকে হাজমহল বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। তাজমহলের পরিকল্পনা কে বা কারা করেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। ফাদার মামরিক এর মতে, তাজের গঠন পরিকল্পনা জারোনিমো ভেরোনা নামে এক ভেনিসিয় শিল্পীর মস্তিষ্ক প্রসূত। কিন্তু পিটারম্যান্ডি, বার্ণিয়ার,টেভার্ণিয়ার প্রমুক-ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণীতে ভেনিসীয় শিল্পীর উল্লেখ পাওয়া যায়না। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে এক ফরাসী থেভেনট হাজ পরিদর্শন করে মন্তব্য করেছেন যে, 'এটি ভরতীয়দের সুক্ষ্ম শিল্প-নৈপুন্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।" অনুরূপভাবে শাহজাহানের সমকালীন কোন ভারতীয় লেখক তাজের নির্মানের ক্ষেত্রে কোন বিদেশী শিল্পীর উল্লেখ করেননি। হ্যাভেলের মতে, 'তাজের গঠন পরীকল্পনা কোন ভেনিসীয় শিল্পী করেছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না।' তাছাড়া তামহলের নির্মাণ শৈলীর সাথে হুমায়ুনের সমাধির যথেষ্ট সাদৃশ্য আবিস্কার করা যায়। হুমায়ুনের সমাধি লাল মর্মর পাথরে অনেক আগেই নির্মাণ করা হয়েছিল আর তাজমহল নির্মাণ করতে ২২ বছর সময় লাগে এবং প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয় হয় বলে উল্লেখ থাকলেও আব্দুল হামিদ লাহোরীর মতে এটি সম্পন্ন করতে সময় লেগেছিল বার বছর এবং খরচ হয়েছিল ৫০ লাখ টাকা। তাজ সম্পর্কে স্যার এডউইন আরলল্ড মন্তব্য করেন–

"Not architectureas all other are
But the proud passion of an
Emperor's Love."

সম্রাট শাহজাহানের যে মতি মসজিকদ নির্মাণ করেন তার নির্মাণ শৈলীও অপূর্ব । দেওয়ান-ই-খাস এর অপূর্ব নির্মাণ শৈলী এবং শিল্পীকর্মের চমৎকারীত্বের জন্যে এটি ' দুনিয়ার বেহেস্ত ' বলে অভিহিত । ভুবন বিখ্যাত ময়ুর সিংহাসন মণি-মুক্তা, হীরা ও মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরী। ময়ুর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের শিল্পানুরাগের অন্যতম এক শ্রেষ্ট নিদর্শন। তিনি 'শাহাজানাবাদ' নামে একটি নতুন শহরও পত্তন করেছিলেন যা বর্তমান পাকিস্তানের লাহোরে অবস্থিত সালিমার উদ্যান সম্রাটের স্থাপত্য রুচির অপরূপ নিদর্শন।

আওরঙ্গজেবের আমলে মোগল যুগ পরিণতির দিকে গমন করে। তাঁর সময় নির্মিত লাহোরের বাদশাহী মসজিদ স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য কীর্তি। তিনি দিল্লীর দুর্গের ভিতরেও নিজের ব্যবহারের জন্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

সম্রাট শাহজাহানের পরবর্তীকালে মোগল স্থাপত্যের অবনতি শুরু হয়। আওঙ্গজেবের স্থাপত্যপ্রীতি খুব একটা ছিলনা বলেই ধারণা করা হয়। তিনি দুটো মসজিদ নির্মাণেই তাঁর স্থাপত্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

পরবর্তী কাল মোগল আমলের পতনের কাল নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যেখানে সংকটজনক ছিল সেখানে স্থাপত্যকীর্তি নির্মাণের প্রচেষ্টা কোনরূপে বিকশিত হতে পারেনা।

তবে মোগল যুগ স্থাপত্য কীর্তির জন্যে এক মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত। মোগলদের কোন কোন স্থাপত্য কর্ম শুধু এ উপমহাদেশই নয়,বিশ্বের বিস্ময় হয়ে বিরাজ করছে।

বাণী চিরন্তন

চার উদ্দেশ্য নিয়ে যারা এলেম অর্জন করেন তারা নির্ঘাত জাহান্নামী। যথা-

১। নিজেকে সবচেয়ে প্রভাবশালী রূপে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে।
২। মানুষের মন জয় করার লক্ষ্যে।
৩। বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রাধান্য অর্জনের লক্ষ্যে।
৪। ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে।

–ইমাম লাইছ সমর কান্দি (রাঃ)

* সু-বচনে ভালোবাসা, বিনয়ে-মর্যাদা, হাসি মুখে-আনুগত্য, ত্যাগে- নেতৃত্ব এবং অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্ব টেনে আনে। –যুল আসরা

* ভদ্র পোষাক পরিধান করার সাথে সাথে স্বভাবটাও ভদ্র করার চেষ্টা করো; না হলে সে পোষাকই বিড়ম্বনারকারণ হতে পারে। –কাজী ইয়াহ ইয়া

* অন্যায় পথ অবলম্বন করে যদি কেউ সফলতা অর্জন করে, তবে সে সফলতা তার সর্বাপেক্ষা বড় পরাজয়। কারণ প্রথমেই সে তার জাগ্রত বিবেককে বিক্রি করে সর্বহারায় পরিণত হয়েছে। –আলী (রাঃ)

* হে দুনিয়ার মানুষ! কার প্রতি ভরসা করো? কবরের অধিকার গ্রহণ করার আগেই কি তোমরা একবার ওখানকার অসহায়তার কথা স্মরণ করবেনা? –আলী (রাঃ)

* অসহায়, দুঃস্থ ভিক্ষুক আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত 'দূত' বিশেষ। তাই দুস্থকে কিছু না দেয়ার অর্থ পক্ষান্তরে আল্লাহর হাতকেই ফিরিয়ে দেয়া। –আলী (রাঃ) *

মানুষের আত্মা অসুস্থ্য হলে , এর চিকিৎসা পাঁচটি বিষয় দ্বারা সম্ভবঃ

২। সল্প আহার করা-তথা বেশি বেশি রোযা রাখা।
৩। রাত জেগে নামায পড়া তথা তাহাজ্জুদ পড়া।
৪। শেষ রাতে আল্লাহর নিকট কাঁন্নাকাটি করা।
৫। আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে উঠাবসা করা।

–জনৈক বুযর্গ

* পাঁচটি বিষয় দ্রুত সেরে ফেলা উচিৎ।

১। মেহমান আসার সাথে সাথে তাকে খেতে দে'য়া।
২। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা।
৩। বালেগা কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দেয়া।
৪। প্রতিশ্রুতি সময় আসার সাথেই ঋণ পরিশোধ করা।
৫। পাপ হওয়া সাথে সাথেই তওবা করে ফেলা।

–আনাস (রাঃ)

* পাপাসক্তদের সাথে বেশি উঠাবসা করোনা। এতে তোমার মধ্যেও পাপের আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে।

–জাফর সাদেক (রাঃ)

* যার সাথে বন্দেগী করার পূর্ণগুণ আছে; পরামর্শ তার সাথে করা উচিৎ।

–জাফর সাদেক (রাঃ)

* মোমিনের জন্য বালা-মুসিবত তাকে ধ্বংস করার জন্য নয়; বরং পরীক্ষা করার জন্য নাযিল হয়ে থাকে।

–জাফর সাদেক (রাঃ)

* অন্যের সম্পদে লোভ না করাও বদান্য চরিত্রের আলামত। –ইমাম জাফর

আত্মসমালোচনা

* যদি তুমি নিজেকে তিরস্কার করতে পার, তবে কারও তিরস্কার তোমাকে শুনতে হবে না। –শেখ সাদী (রহঃ)

* রাতে শুয়ে দিনের কাজগুলির কথা একবার মনে মনে ভাব। –ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)

* বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে আত্মসমালোচনা করে এবং পরকালে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে।

* সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজের চিন্তা করা এবং নিজের দোষত্রুটি সংশোধন করতে সচেষ্ট হওয়া। –আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)

* অন্যের দোষত্রুটি গেয়ে বেড়ানোর মত পর্যাপ্ত অবসর যে ব্যক্তি করে নিতে পারে, তার চাইতে বড় হতভাগ্য আর কেউ হতে পারে না। –হযরত ওসমান (রাঃ)

স্মরণীয় ও বরণীয়

♠ দুনিয়ার মহব্বত সমগ্র পাপের মূল
♠ যার সততা কম তার বন্ধু কম
♠ যার কথা বেশি তার ভুল বেশি
♠ যে জিহবাকে সংযত রাখে সে অনুতপ্ত হয় কম
♠ যে অধিক কৌতুক করে তার গাম্ভির্যতা লোপ পায়
♠ যে খোটা দেয় তার অনুগ্রহ বিনষ্ট হয়
♠ যার লজ্জা কমে যায় তার পাপ বেড়ে যায়
♠ যার চরিত্র উত্তম তার বন্ধু বেশি
♠ যে নিজ রহস্য লুকিয়ে রাখে তার উদ্দেশ্য পূরণ হয়
♠ যে যাকে ভালবাসে তার আলোচনা বেশি করে
♠ যে দীর্ঘায়ু হয় সে বন্ধু-বান্ধব হারায়
♠ যে সব কিছুর লোভ করে সে সবকিছু থেকেই বঞ্চিত হয়

নারী জীবনের দুই রূপ

-শামসুন নাহার শিবলী

নারী সৌন্দর্যের আকর। নারীর অবর্তমানে পুরুষ জীবন অশান্ত-অপূর্ণ। নারীবিহীন পৃথিবীর আরাম-আয়েশ, শান্তি অকল্পনীয়, অসম্ভব, অবান্তর। পৃথিবীতে যত কিছু স্বার্থকতার রূপ নিয়েছে, নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসেই তা নিয়েছে। কেননা- জীবন চলার দূর্গম পথে নারী-পুরুষের,পুরুষ নারীর প্রেরণার উৎস। পবিত্র কুরআনে নারী-পুরুষকে একে অপরের অংশ বলা হয়েছে- ' 'তোমরা একে অপরের অংশ'। (ইমরান-১৯৫) অন্যত্র - 'তারা তোমাদের পোশাক, তোমরা তাদের পোশাক'- এর দ্বারাও নারী-পুরুষ যে একে অপরের সম্পূরক বা একে অন্যের মুহতাজ তা অনুধাবন করা যায়।

নারী জীবনের দু'টি রুপ রয়েছে। বক্ষমান নিবন্ধে নারীর সে দু'টি রুপ নিয়ে আলোচনা করাই উদ্দেশ্য।

নারী-স্ত্রীঃ বিয়ে নামক এক পবিত্র বন্ধনের মাধ্যমেই নারী একজন পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হয়ে ওঠে। পুরুষটির সাথে তার দাম্পত্য জীবনের শুভ সূচনা হয়। অবশিষ্ট জীবনে চলার পথে পুরুষটিকে সে পরম সাথী ও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। আর পুরুষটিও তার বাঁকী জীবনের সকল প্রয়োজন মেটানোর কাফিল বা যিম্মাদার বনে যায়। এক সময়ের অচেনা-অজানা স্বামীর গৃহের সকল মানুষ গুলোকে একান্ত আপন করে নেয় নারী। স্বামীর সকল কিছুকেই নিজের হিসেবে মেনে নেয় সে।

স্বামীর দূঃখে-কষ্টে, আরাম-আয়েশে সমভাগে ভাগী হয় নারী। স্বামীর আনুগত্যের মাধ্যমে তার আদর সোহাগ, প্রেম-ভালবাসা লাভে ধন্য হয়। সে আর এধরনের আনুগত্যশীলতা নারীর প্রসংশা পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে– 'সে মতে নেক্কার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুদাতা এবং আল্লাহ যা হেফাজত যোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তা হেফাজত করে'। (সূরা নিসা-আয়াতঃ ৩৪) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনৈক মুফাসসির লিখেন– "সতী স্ত্রীগণ স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের এবং স্বামীর ইয্যত-আব্রু ধন-সম্পদ হেফাযত করে, তাদের স্বভাবটাই আল্লাহ তাআলা এরূপ করে দেন। স্বীয় সতীত্ব রক্ষা ও স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে সে বেহেশতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ কতে পারবে। "সতী-সাধ্বী ও আনুগত্যশীলা নারীগণের মর্যাদা ও স্থান উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হলো। পক্ষান্তরে নারী যদি স্বামীর আনুগত্যশীলা না হয়ে কপট চরিত্রের অধিকারী হয় তাহলে সকাল থেকে সাঁঝ পর্যন্ত সে নারীর উপর অভিসম্পাতের বৃষ্টি অঝোর ধারায় ঝরতে থাকে।

ইসলামী শিক্ষায় কুফুরী কিংবা শরীয়ত বিরোধী কোন নির্দেশ ভিন্ন পালনযোগ্য স্বামীর সকল নির্দেশনাই স্ত্রীর মানা অপরিহার্য কর্তব্য।

হাদীসে এসেছে-রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন– যদি স্বামী স্ত্রীকে কোন প্রয়োজনে আহবান করে, তাহলে তার জন্যে উচিৎ তৎক্ষণাৎ স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়া। চাই সে উনুনের পাশে থাকুক না কেন (অর্থাৎ চাই সে উনুনের পাশে রুটি ইত্যাদি পাকাতে থাকুক না কেন)।

স্ত্রীর জন্যে স্বামীর যে কোন আহবান সাড়া দেয়ার মাঝেই মূলতঃ স্বামীর আনুগত্য প্রকাশ পায়। আর স্বামীর আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর সাথে একজন স্ত্রীর দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা সম্পৃক্ত। স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে এবং স্বামী স্ত্রীর সকল প্রয়োজনাদি পূরণ করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে, এমনিভাবে একে অপরের মনোরঞ্জনে নিজেকে নিয়োজিত রাখলে নারী-পুরুষের-দাম্পত্য জীবনে এ পৃথিবীতে স্বর্গীয় সুখ লাভ হয়। একটি শান্তি-সুখের নীড় রচিত হয় দুটি জীবনের মিলন সম্মিলনে। দেখা দেয় না সেখানে অশান্তি ও দুঃখ-কষ্টের ছোঁয়া। এ মধুময় সম্পর্কের ইশারা করেই পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে– "তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের লেবাস স্বরুপ, তোমরা (স্বামীর) তাদের লেবাস স্বরুপ।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনৈক মুফাসসির লিখেন–" এখানে লেবাসের মধ্যে প্রায় বিশটি অর্থ লুকায়িত।

তন্মধ্যে ক'টি যেমন, তারা তোমাদের আবরণ, (পর্দা), তোমরা তাদের আবরণ, তারা তোমাদের শোভা, তোমরা তাদের শোভা। তারা তোমাদের সৌন্দর্যের

প্রতীক, তোমরাও তাদের সৌন্দর্যের প্রতিক। তারা তোমাদের জীবচনের পরিপূর্ণতার মাধ্যম, তোমরাও তাদের জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের মাধ্যম। আর এসবগুলোই নারী-পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাকসাদ।" নারীর সতীত্ব স্বামীর এক অমূল্য আমানত। সুতরাং এ আমানত রক্ষাও নারীর এক অপরিহার্য কর্তব্য। এ ছাড়া যে নারী তার সতীত্বের ব্যাপারে স্বামীর খিয়ানত করে না, স্বামীর ধন -সম্পদেরও আমানতদারী রক্ষা করে, স্বামীর হৃদয়-মনেও কোন দিন দুঃখ দেয় না, তার ব্যাপারে রাসূলের প্রশংসাবাণী এসেছে। তিনি বলেন+ "চারটি জিনিস এমন-যেগুলো কোন কোন মানুষ পেয়ে গেলে, সে যেন ইহজনম ও পরজনমের সকল মঙ্গলামঙ্গল পেয়ে গেল। **এক**.কৃতজ্ঞ অন্তর । **দুই**. আল্লাহরযিকিরে মশগুল যবান। **তিন**. বিপদ মুসীবতে ধৈর্যধারণকারী শরীর। **চার**. স্বীয় সতীত্ব ও স্বামীর মালে আমানত রক্ষাকারী স্ত্রী। স্বীয় সতীত্ব ও স্বামীর ধন-সম্পদের হেফাযতের পাশাপাশি সর্বদা স্বামীর মনোতুষ্টির ব্যাপারেও স্ত্রীকে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য। কেননা নারীর পরকালীন মুক্তির জন্য এটা একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। হাদীসে এসেছে-"যে নারীর এ অবস্থায় মৃত্যু হল যে, স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট ছিল। তাহলে সে বেহেস্তের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।"(ইবনে মাজাহ্)

পক্ষান্তরে যে নারী স্বামীর মনে কষ্ট দিয়ে থাকে, তার জন্যে বেহেশতের আশা করাও দুরূহ ব্যাপার। হাদীসে এসেছে – " তিন ব্যাক্তির নামায ও নেক কাজ কবূল হয় না । **এক**-পালিয়ে যাওয়া গোলাম (কৃতদাস), যতক্ষণ না সে ফিরে এসে মনিরের হাতে স্বীয় হাত রাখে। **দুই**.-ঐ স্ত্রী, যার উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট। **তিন**. মদ্যপানে মাতাল হওয়া ব্যক্তি, যতক্ষণ না তার হুঁশ ফিরে আসে। (বাইহাকী) যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন বেহেস্ত হতে ঐ ব্যক্তির হুর উক্ত স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলতে থাকে- "তুমি তাকে কষ্ট দিওনা। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। সেতো তোমার নিকট মুধু মুসাফরের জীবন-যাপন করছে। অচিরেই সে তোমা হতে বিদায় নিয়ে (চিরদিনের জন্য) আমাদের নিকট চলে আসবে।" (তিরমিযী), ইবনে মাজাহ)

বিভিন্ন হাদীসে মহানবী (সাঃ) -এর পবিত্র যবান মুবারকে যে সকল নারীর প্রশংসাবাক্য উচ্চারিত হয়েছে বর্তমান সমাজে এধরনের নারীর অস্তিত্ব নেই বললেও ভুল হবেনা বরং আধিক্য ঐ সকল নারীর - যারা ইসরামী শিক্ষা - দীক্ষায় একেবারেই অজ্ঞ-মূর্খ। উপরন্তু ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে তাদের কোন আকর্ষণ ও নেই। ফলে এ সকল নারী-যারা অহর্নিশ পার্থিব আরাম-আয়েশ, ভোগ - বিলাসের মাঝে জীবন - যাপন করার পর স্বামীর গৃহে হঠাৎ কোন দিন সামান্য অস্বচ্ছলতা দেখলে স্বামীকে সান্তনা দেয়ার পরিবর্তে হা- হুতাশে সংসারের সুস্থ পরিবেশ ভারী করে তোলে । মনে হয় যেন স্বামী তাকে সারা জীবন কষ্টের মাঝে রেখেছে। 'স্বামীর সারা জীবনের ইহসান, দান-অনুদান, প্রেম-ভালবাসা, আদর-সোহাগকে অস্বীকার করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। রাসুলুল্লাহ (সঃ) - এর হাদীসের একটি টুকরা তাদের হুবহু এ আচারণটির দিকে ইঙ্গিত করেছে। বলা হচ্ছে-"(মনে হয় যেন) সে কখনো (স্বামীর গৃহে) সচ্ছলতা দেখেনি" (বুখারী শরীফ)

উপরোক্ত হাদীসের টুকরাটিতে অকৃতজ্ঞ নারীর স্বভাবগত আচরণের একটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। লাজ-লজ্জার আকর নারী যদি খোদা নাখাস্তা কখনো স্বামীর পক্ষ থেকে সামান্য একটু কষ্ট পায়, তখন স্বামীর সারা জীবনের অবদানের উপর ছাই মারতেও দ্বিধা করে না। অথচ সারাটা জবিন স্বামী তার সুখ - ভোগের সামগ্রী যোগাতে ছিল ব্যস্ত। রাসূলূল্লাহ (সাঃ) যখন মি'রাজে গিয়েছিলেন, তখন তিনি দোযখে নারীদের সংখ্যাই অধিক দেখেছিলেন। তার কারণ জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারলেন যে, "তারা স্বামীদের অপবাদ অভিযোগকে বৈধ মনে করত । যার কারণে আজ তাদের এ অবস্থা।"

আজ যারা স্ত্রী অবস্থায় স্বামীর গৃহে অবস্থান করছেন, তাদের জন্য পবিত্রাত্মা নবী-পত্নীগণের মুবারক জীবনী উপস্থিত রয়েছে। তারা ইচ্ছে করলে সে সকল পত্নীগণের জীবনী অনুসরণ করে এ পৃথিবতিেই স্বামীকে নিয়ে সুখের স্বর্গ রচনা করতে পারেন।

নারী-মাঃ ইসলামী শিক্ষায় মায়ের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে । তাঁর স্থান ও মর্যাদা সকরের শীর্ষে । পবিত্র কুরআনে মার সাথে সুন্দর ও সৎ ব্যবহার করার জন্য যেমনি ভাবে নির্দেশ এসেছে, তেমনিভাবে মার সাথে অসদ্ব্যবহারের উপর কঠোর হুমকি ও সাবধানবাণী এসেছে। এরশাদ হচ্ছে- " তোমরা পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর। যদি তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়েই বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়, তখন তাদের সঙ্গে "উফ" শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করোনা। (বনী ইসরাঈল - ২৩) (অর্থাৎ - তোমাদের কোন আচরণে যেন তাদের মুখ দিয়ে "উফ" শব্দটিও বের না হয।)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে- " আমি মানব জাতিকে তাদের মিাতা পিতার সাথে সুন্দর ও সদ্ব্যবহার করার তাগিদ দিয়েছি।" (আহ্জাফ-১৫)

এতো গেল মায়ের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বাণী। এ ছাড়া রাসূলের এক বিরাট হাদীস - ভান্ডার মার মর্যাদা সম্পর্কে মওজুদ রয়েছে। অসংখ্য রেওয়ায়েতে মার মর্যাদা -মর্তবা ও তার সুউচ্চ মাকাম সাম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, কোন এক ব্যক্তি রাসূলে পাক (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলো - ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সুন্দর ও সদ্য ব্যবহারের কে অধিক হকদার? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিলেন তোমার মা। সে সাহাবী দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করলো- তারপর? এবারও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিলেন তোমার মা। উক্ত সাহাবী তৃতীয় বার প্রশ্ন করলো- তারপর? এবারও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিলেন তোমার মা। চতুর্থ বারের প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, অতঃপর তোমার পিতা তোমার সদ্ব্যবহারের অধিক হকদার।

হযরত জাহমাহ (রাঃ) রাসূলে পাকের খেতমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিহাদে যাওয়ার ইরাদা করেছি। তাই আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন তোমার মা কি জীবিত আছেন? সাহাবী জবাব দিলেন জী হ্যাঁ। জীবিত আছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন- হে জাহমাহ (রাঃ) যাও তোমার মার নিকট এবং তার খেতমতে নিয়োজিত হও। কেননা জান্নাত মার কদমের নীচে। (আহমাদ, নাসায়ী) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, ইয়া মানবাসী জনৈক সাহাবী জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য রাসূল (সাঃ) নিকট হিজরত করে আসলেন।

রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন- ইয়ামানের তোমার প্রিয়জন কেউ আছেন কি? সাহাবী উত্তর দিলেন-জি হ্যা! আমার মাতাপিতা রয়েছেন। রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন- যাও তাদের নিকট গিয়ে অনুমতি চাও। যদি তারা অনুমতি দেন,তাহলে জিহদে যাবে, অন্যথায় (সেবা যত্নের মাধ্যমে) তাদের সাথে সুন্দর ও সদ্ব্যবহার কর। কেননা- এটাই তোমার জন্য জিহাদ।(আবূ দাউদ শরীফ)

পূর্বের আয়াতে কুরআনী এবং উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা খুব ভালভাবে অনুধাবন করা যাচ্ছে যে, ইসলামী শিক্ষার মার মর্যাদা কত সুউচ্চে স্থান দিয়েছে।

মাতা পিতার দিকে মুহাব্বতের দৃস্টিতে দেখাও-ইবাদত তুল্য। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে সাওয়াব প্রদান করে থাকেন।

মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেন- পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী সন্তান যদি পিতামাতার দিকে মুহাব্বতের দৃষ্টিতে দেখে,তাহলে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করার দ্বারা একটি মকবূল হজ্জের সাওয়াব আল্লাহ প্রদান করেন। (মুসলিম শরীফ)

সাহাবীগণ আরয করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি প্রত্যেকদিন এক'শ বার দেখে তাহলে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন- প্রত্যেকবার দৃস্টি নিক্ষেপ করার দ্বারা একটি মকবুল হজ্জের সাওয়াব আল্লাহ দিবেন না-তোমার এ ধারনা থেকে আল্লাহ পাক পবিত্র ।"

হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা দশটি ওসীয়ত করেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, স্বীও পিতা- মাতার সাথে নাফরমানী করোনা, যদিও তারা তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন ছেড়ে পৃথক হয়ে যেতে বলেন। (মিশকাত)

হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বললেন- আমার মাতা যিনি মুশরিক ছিলেন, আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি আসলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করালাম আমি কি আমার সাথে সম্পর্ক রাখব এবং সদ্ব্যবহার করব? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন-হ্যাঁ, তোমার মার সাথে সম্পর্ক কায়েম রাখবে এবং সদ্ব্যবহার করবে।(মিশকাত)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের পর মার-মর্যাদা ও তার সুউচ্চ মাকাম সম্পর্কে আর কিছু বর্নণার অপেক্ষা রাখেনা। দু'টি পংক্তির মাধ্যমে আমার এ নিবন্ধটির খাতেমা টানতে চাই। যে পংক্তির মাধ্যমে দুটির মাওলানা মাতা-পিতার খিদমতের দর্শন স্বীয় জীবনে গ্রহন করার উপর জোর দিয়েছেন।

মাতা-পিতার খিদমত কর সকাল সাঁঝে,
সুনাম তোমার ছড়াবে তাতে ধরণীর মাঝে।

তুমি চল কার ইশারায়

রাবে আল হুসাইনী

এই তোদের আসার সময় হল!
সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি, তোরা এলি বলে !
সময় মতই পৌছুতাম । কিন্তূ
কিন্তু কি ?
পথে সমস্যা বেঁধে গিয়েছিল । এক ঝুট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম আর তাই ----------
দেরী হয়ে গেল । এইতো ?
ঠিক ধরেছিস । তা হামীম ! আজকের মত----------
থাক , অনেক হয়েছে. যামীল ! সত্যি বড় এক ঘেয়ে লাগছে । কর্ম ব্যস্ততা আর পড়ার চাপে ভারী ক্লান্ত হয়ে গেলাম সুযোগ যখন একটা হলোই , দেরী নয়, চল কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি । স্বস্তি ফিরে আসবে কর্মোদ্দিপনা ও বাড়বে । আমরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি ।এখনই বেরে হওয়া যায় । ১৪ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ফজরান্তেই সকল জিনিস পত্র গুছিয়ে নিলাম । পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক রওয়ানা হয়ে গেলাম । সকল সঙ্গী চার জন । আমি রাবে আল হোছাইনী, বদর, মাসুম ও বশীর বাসার গেইট থেকে রিক্সা ডেকে বাসষ্ট্যান্ডে চলে এলাম । কাউন্টারের থেকে টিকেট নিয়ে চেয়ার কোচে উঠে বসলাম । সাথে ছিল গুরুত্ব পূর্ণ কিছু বই । মাইকেল এইচ হার্টের " দি হান্ড্রেড " গ্রন্থটিও ছিল । বই পড়া আমার একান্ত প্রিয়। সুয়োগ পেলেই হাতের কাছে শালীন যা পাই, পড়তে শুরু করি। শেষে না করা পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি ফিরে না। তাই অপ্রয়োজনীয় কথা না বাড়িয়ে আমি বাসে চড়েই হাতের বই খানা পড়ছিলাম। সঙ্গীদের ও পড়ার জন্য কয়েকটি বই বের করে দিলাম । শোঁ - শো - করে আমাদের গাড়িটি গন্তব্যের দিকে চলতে লাগলো। মৃদু সমীরণ আর রূপ জৌলুসে ভরা প্রকৃতি আমার মন ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

বইটির ক' পৃষ্ঠা উল্টাতেই দেখি মুহাম্মদে আরাবীর নাম। গ্রন্থকার কতৃক তার (সাঃ) শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান কিছুটা কৌতুহলের হলে ও নিরেট সত্য যে নবীজী (সাঃ) ই পৃথিবীর সেরা মানুষ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। জ্ঞান-বিজ্ঞান, আদর্শ , সভ্যতা-দর্শন, সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি, মানবতা বোধ তথা এ জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন একচ্ছত্র শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। বইটি বেশ মোটা । প্রান্ত সীমায় পৌছা গেল না। বাতাসে ভর করে এলো মিষ্টি মধুর আহ্বান । হৃদয় তোলপাড় । তার ডাকে মাতোয়ারা। বার বার হৃদয় তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনীত হচ্ছে- "সালাতের দিকে এসো, এসো কল্যাণের দিকে," ছন্নছাড়া আমি । কল্যাণের প্রয়োজন গুরুতর । বড়লেখা পেরিয়ে মাঝ পথে বিরতি। নিজেকে পাক সাফ করে নিলাম পবিত্র করলাম ধূসর চিত্তকে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে একাকার হয়ে গেলাম ঐ প্রভূত কল্যাণ দাতার সাথে। সঙ্গোপনে বলতে থাকলাম - "সুবহানা রাব্বিআল আলা, সুবহানা রাব্বিআল আলা"। আদায় করলাম জুমআর সালাত।

তারপর ! এগিয়ে যাচ্ছি গন্তব্যে। রিক্সা যোগে। সংকীর্ণ পথে । ছোট ছোট পাহাড়, আনারস ও চা-বাগান চারদিকে । বড় মনোহর ! বনশ্রী ! ওরা যেন আমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে।

চা-বাগানের কর্মচারী ও উপজাতি সহ সাধারণ মানুষের সাথে আমাদের বেশ কথা হয় "আফনেরা কন্ত নি আইছইন, আফনেরা বালা আছইননি খুব পেরেশানি খইবা আইছইন, যাইবানে" ইত্যাদি, আরও অনেক। ওরা সহজ সরল, ভোলা ভালা , কর্মঠ, উচ্ছল, তাদের ভাষা বুঝতে কষ্ট হলেও আমরা বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করছিলাম । হঠাৎ ঘড়ির পিঁ পিঁ শব্দ । বেলা তিনটা পেরিয়ে গেল বলে । রাস্তা ঘাট চলার অনুপোযোগী । দীর্ঘ দিন হয়তো মেরামত হয়না। তবু খানিকটা ভোগান্তির মধ্যে দিয়ে দর্শনীয় স্থানে পৌছলাম দু'পাহাড়ের মাঝ দিয়ে একটি পথ। উৎসুকদের জামায়েত ভারী। গাঁজর, খিরাই ইত্যাদি কিনে নিলাম । বদর বললো- এগুলো ভিতরে যেয়ে খাওয়া যাবে । এর আগে রেস্তোরায় যাওয়া যাক । প্রস্তাব যুক্তিসংগত পার্শ্বস্থ পর্যটক রেঁস্তোরায় ঢুকে পড়লাম । মেসিয়াররা আমাদের ব্যাগ গুলো সযত্নে রাখলো । বেসিন- এ নিয়ে গেল একজন। দ্রুত ফ্রেস হয়ে নিলাম । তোয়ালে বাড়িয়ে দিল এক ছেলে । সবাই হাত মুখ মুছে টেবিলে বসলাম । কি খাব এনিয়ে কিছুটা দ্বিধা বিভক্তি হয়ে গেল। বললাম –ক্ষিধে নিয়ে চলতে ভারী কষ্ট বটে আবার ভরা পেটে পাহাড়ে চড়াও কঠিন । আপাতত হালকা নাস্তা হতে পারে ।

স্বল্প সময়ে নাস্তা সেড়ে শুখ হেসে বিদায় নিলাম । ধর্মীয় আলোচনার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চললাম সামনে বাড়তেই ইকোপার্ক ইতোপূর্বে যার নাম শুনেছি অনেক আঁগ্রহ হলো, আজ দেখবো কিন্তু

ইকোপার্কে দর্শনীয় কিছুই ছিলনা । শুধু সুপারি গাছ এবং পানের বরজ যেন নিরবতা পালন করছে। কিছুদুর এগুতেই দেখি বিশাল বড় পাহাড়। পাহাড়ের চতুর্দিকে বিস্তৃত, মাঝে সমতল। পর্যটদের ভীড় ওখানে । দক্ষিণে মাধবকুন্ডের স্বপ্নীল বর্ণীল সেই জলপ্রপাত। যা দেখার চাপা অভিলাষে আমাদের এই সফর। প্রপাতটি পাহাড় ঘেঁষে উপর থেকে নিচে প্রবাহিত হচ্ছে নিরবধি। অব্যাহত জলস্রোতে নিচে পুকুর হয়ে গেছে। চতুর্পার্শ্বে প্রস্তর খন্ড। পুকুর থেকে একটি নালা বয়ে গেছে পাহাড়ের পাশ দিয়ে, অনেকই পানিতে নেমে গোছল করছে, সাঁতার কাটছে। কেউ কেউ ইচ্ছেমত ছবি উঠাচ্ছে। মাছুম বলল–" গোছল করবো।" আমারও আগ্রহ ছিল, কিন্তু ঠান্ডা লাগার আশংকায় সঙ্গীদের গোছল করতে নিষেধ করলাম। বললাম-" অযু করে নাও , সালাত আদায় করতে হবে।" মাছুম জিদ ধরে পানিতে নেমে পড়ল। অযু করতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলাম। ওরা সবাই উপহাসের হাসিতে উল্লাসিত হলো। ভাবলাম -হয়তো আল্লাহর ইচ্ছে এই ছিল, আমাকে তার কুদরতের প্রপাতের পানিতে গোছল করাবেন। কিছুক্ষণ পর অনুভব হলো ছোট ছোট মাছ শরীরে ঠোকরাচ্ছে। আমি বিস্মিত হলেও ভাবলাম- মাছের রাজ্যে হয়তো এটাই অতিথিদের সাদর সম্ভাষণ জানানোর রেওয়াজ। আমার সাধ জাগলো মাছ ধরবো । মাছ ধরার সখটা ছোট বেলা থেকেই লালিত। বশী- জাল দিয়ে, গ্রামের ছেলেদের সাথে ঝিল সেঁচ করে, কখনওবা হাওরে গিয়ে নানা কৌশলে মাছ ধরা ছিল আমার এক রকম নেশা। এখানে তেমন সময়, সুযোগ, উপায় ও উপকরণ নেই। তাই গামছা দিয়ে মাছ ধরার প্রয়াস চালালাম শেষ পর্যন্ত ধরেও ফেললাম অনেক। ঢাকার বাজার দরে কম করে হলেও দু'শটাকার মাছতো হবেই। পুকুর থেকে উঠে আসতেই অনাকাংখিত জনৈক ব্যক্তির কৈফিয়ত তলব– "আফনোরা মাছ ধরলাই খেনে? বললাম ধরার জিনিস তাই।" লোকটির আত্ম পরিচয় হলো -সে এখনকার গার্ড। মাছগুলো ফেরৎ দিয়ে দিলাম। মাছগুলো নিয়েই সে ছেড়ে দিল পুকুরের পানিতে।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কাজ দ্রুত করতে হবে । সন্ধার পূর্বেই। উত্তর দিকে বড় একটি অন্ধকার গুহা। তার ভিতরে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে দেখি বিশাল পাহাড়টি আমাদের মাথার উপরে ছাদের মতো বিস্তৃত। শংকা হলো ধ্বসে পড়লে কি হবে? হয়তো এখানে চারটি জীবন প্রদীপ স্তিমিত হয়ে যাবে। আসহাবে কাহাফের মতো হয়তো অজানাই থেকে যাবো আমরা। সবুজ, শ্যামল ও তরুতলা ঘেরা পাহাড়ের শীর্ষে উঠতে হবে আমাদের । কিন্তু কিভাবে উঠবো ভাবছি? পথটার সবটাইতো অজানা। সাধারণত কেউ ওখানে উঠেনা। যাহোক ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম। এসময় একটা কিশোর পানির বোতল হাতে নিয়ে দৌড়ে এল। তারপর নরম সূরে বলল- "স্যার পাহাড়ে উঠবেন? তাহলে পানি নিয়ে উঠেন।" ছেলিটির বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হলাম। তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার প্রশস্ত দু'টো চোখ আর চেহরায় ক্লান্তির ছাপ। তবুও দেখে মনে হচ্ছে কোন ধনীর দুলাল ।

কৌতূহল বসে জিজ্ঞাসা করলাম-

– তোমার নাম কি?

– সোহাগ!

– পিতার নাম?

– রফিকুল ইসলাম!

– ভাই-বোন?

– আমি একাই।

– তুমি এভাবে.....?

মা ক্যান্সারে মারা গেছেন বছর তিন হয়। বাবা আবার বিয়া করছেন, লন্ডন থাকেন। সৎ মা আমাকে মারধর করে। তাই রাগ করে বাড়ি ছেড়ে এসেছি। আর বাড়ি যাচ্ছিনা। এখানে পানি বিক্রি করি। রাতে এক বাড়িতে থাকি। পরিচয় হয়েছে এখানে এসে। ওরা আমাকে খুব আদর করে। ওরাও গরীব; কাজ করে খায়।

কিশোরের বৃত্তান্ত শুনে মর্মাহত হলাম। অজান্তেই আঁখিজলে কপোল ভিজে গেল। সাধ্যমত সহানুভূতি জানানোর চেষ্টা করলাম। সে বলল- "আপনারা এদিক দিয়ে পাহাড়ে না উঠে, দক্ষিণ পাশ দিয়ে উঠুন; ওদিকে উপরে উঠার জন্য পাথর কেটে সিঁড়ি করা আছে। লোকজন ওদিক দিয়েই উঠানামা করে। এদিক দিয়ে উঠতে আপনাদের কষ্ট হবে। পা পিছলে পড়ে যেতে পারেন। তাছাড়া বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুরও ভয় আছে। বললাম- না আমরা এখান দিয়েই উঠবো। পাহাড়ে উঠা আমাদের শিখতে হবে। আমরা মুসলমান বীরের জাতি কাশ্মীরের মুজাহিদদের তো এ ধরনের পাহাড় মাড়াতে হয় প্রতিনিয়ত। তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে। ওরা আমাদর ধর্মীয়-ভাই। কোন সময় তাদের পাশে দাঁড়াতে হলে তখন তো এর চেয়ে বড় বড় পাহাড়ে উঠতে হবে। তাই আজ অভিজ্ঞতা অর্জন করবো। কাঁধ থেকে ব্যাগগুলো নামিয়ে ছেলেটির কাছে রেখে উঠতে শুরু করলাম। সাথে একটি মাত্র ব্যাগ আর পানির বোতল । সোজা উপরের দিকে উঠছি। গাছ, লতা-পাতা ও গাছের মূলে ভর করে। তখনও ছেলেটির মর্মান্তিক কাহানী আমাকে বার বার তাড়িত করছিল। হায়রে মানুষ! কিভাবে মা-মরা ছেলেটাকে মারধর করে বাড়ি ছাড়া করতে বাধ্য করলো! হয়তো তাকে খোঁজার কেউ নেই। নেই নিরাপদ মমতার আশ্রম।

ততোক্ষণে পাহাড়ের অর্ধেক এসে পৌঁছেছি। সব সাথীরা আমাকে পিছনে ফেলে গেছে। আমি আর সামনে বাড়িতে পারছিলামনা। অজানা শংকায় আঁতকে উঠি, নানা দূর্ভাবনা ঘিরে ধরে আমাকে। হাত-পা নিশ্চল

হয়ে যায়। ভেতরটা শিউরে উঠে। হৃদকম্পন বেড়ে যায়। এই বুঝি জীবনের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে গেছি। হয়তো ফিরে যাওয়া হবেনা স্বজনদের কাছে। দুআ দরুদ যা মুখস্থ ছিল -পড়ে নিলাম। বার বার করুণাময়ের সাহায্য কামনা করছি। পরক্ষণই নিজেকে প্রবোধ দিলাম, অভয় দিলাম, শক্ত করলাম। –না; পিছালে হবেনা। আমাকে উঠতেই হবে, শিখতেই হবে পাহাড়ে উঠা। নবী, সাহাবী,তাবেয়ী প্রমুখদের চেয়ে আমার জীবনের মূল্য বেশী না। হতে পারেনা।

মনে পড়লো আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বের ইতিহাস। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) ওহী পাওয়ার পূর্বে হেরা গুহায় ধ্যান মগ্ন থাকতেন। তার প্রিয়াতমা স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) সেখানে রাসূল (সাঃ) এর জন্য খাবার নিয়ে যেতেন। ভেবে বিস্মিত হলাম। এত বয়োবৃদ্ধা নারী কিভাবে এত উঁচু পাহাড়ে উঠতেন! হেরা গুহাতো এর চেয়ে অনেকগুনে বেশী উঁচু উঠতে আরোও কষ্ট হতো। আপন স্বামীর ভালোবাসাই তাঁকে এতো উপরে উঠাতো। না-হয় এই বয়োবৃদ্ধা নারীর জন্য এভাবে উপরে উঠা সম্ভব ছিলনা। মূলত আল্লাহ্- তাঁর প্রিয় নবী (সাঃ) কে যথাযথ সহোযোগিতার জন্যই খাদীজা (রাঃ) কে সৃষ্টি করেছিলেন।

এসব ভেবে আবেগ আপ্লুত হয়ে উপরে চড়ছিলাম। হঠাৎ একটি লতায় ভর করতেই লতাটি ছিড়ে গেল, একটি নাম না জানা জংলী গাছের ডালে জড়িয়ে কোন রকমে বেঁচে গেলাম। আসলে ওটা ছিল মৃত লতা। ভয় ভীষণ বেড়ে গেল। হয়তো এখানেই আজরাইলের সাথে সাক্ষাৎ হবে। অতি সন্তর্পণে সামনে এগিয়ে চললাম। সাথীদের কারো খোঁজ নেই। কে কোথায়? আরোও কিছু উপরে উঠার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। ভীষণ তৃষ্ণা পেল আমার। কিন্তু সাথে পানি ছিলনা। ছেলেটির কথা মনে পড়লো " স্যার পানি নিয়ে যান, পাহাড়ে উঠলে তৃষ্ণা লাগবে।" হঠাৎ বশীরকে পেয়ে গেলাম তার কাছ থেকে পানি নিয়ে প্রাণ বাঁচালাম। বদর , মাছুম ও আমার আওয়াজ শুনে জড়ো হলো। বশীর কুরআনের আয়াত পড়তে লাগলো " আফালা ইয়ান যুরুনা---------- ওয়া ইলাল জিবালি কাইফা নুসিবাত" (গাসিয়া) । সাথে সাথে আমার ও মনে পড়লো অপর একটি আয়াত " ওয়াল জিবালা আওতাদা " (নাবা) মহান আল্লাহ তাআলা পাহাড়কে পৃথিবীর জন্য খুঁটি রূপে সৃষ্টি করেছেন, না হয় পৃথিবী টলমল করতো ,উল্টেও যেতে পারতো। তখন বুঝতে পারলাম এই আয়াতের যথার্থতা। সত্যিই আল্লাহ তাআলা পাহাড়গুলোকে অনর্থক সৃষ্টি করেনি।

সবাই একত্রে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে একসময় একটি নালার কাছে পৌঁছলাম বড় আশ্চর্য লাগলো, পাথরের পাহাড়ে এরূপ নালা সৃষ্টি হলো কিভাবে!?। এর উৎস কোথায়? প্রবাহমান নালার পার্শ্ব ধরে এসে দাঁড়ালাম প্রত্যাশিত জলপ্রপাতের কাছে। সৃষ্টির বড় বিস্ময়, আমরাও বিস্মিত। কয়েকটি বড় বড় পাথরের মাঝ দিয়ে ফোয়ারার মত পানি উথলিয়ে নিচে পড়ছে। অবিশ্বাস্য মনোহর মোহনীয় কুদরতের ছোঁয়া , নিখুঁত পথ-নির্দেশ। তাই বুঝি ঝর্ণাটি ফুলের মত মনলোভা কিংবা তার শক্তিধর স্রষ্টার ভয়ে নিভৃতে সে অবিরাম কাঁদছে! নাকি স্রষ্টার প্রশংসায় এটা তার তাসবীহ কলরব! কুদরতের এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে মন আবেগ-আপ্লুত হয়ে গেল। পাহাড় থেকে এইভাবে পানি নিসৃত হচ্ছে- কি রহস্য? শুধু এমনিতেই এমনটা হবে কেন? ফিরে যেতে হয় স্রষ্টার কাছে। কুরআনের বর্ণনায় পাওয়া যায়- " পাথরের মধ্যে এমনও আছে, যা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে।" (বাকারা–৭৪) সবকিছু মিলে অনিন্দ আনন্দে আন্দোলিত হলাম। দুঠোঁটে উচ্চারিত হতে থাকলো " ইউসাব্বিহু লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওমা ফিল আরদ্ব" (সূরা-জুমআ) । অর্থাৎ-"নভোমন্ডল এবং ভুমন্ডলে যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে।"

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে দিবাকর অস্তাচলে গিয়ে মিলে গেল, চারদিক ছেয়ে গেল আঁধারে। চোখের আড়ালে চলে গেল কুদরতের সে সৌন্দর্য আর বিস্ময়। এখনই নিচে নামতে হবে। এদিকে মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে কিছু আগেই তাই তাড়াতাড়ি করে নামাজ আদায় করলাম। সন্ধা নামলে ডাকাতের উপদ্রব আছে সেখানে। তাই তড়িঘড়ি করে নিচে নামার পথ খুঁজছিলাম। কুদরতের আরেক বিস্ময়, পূর্ণ জোছ্না আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। তারপর শুরু হলো নিচে নামা। কিছক্ষণ পথ চলার পর নিচে নেমে আসলাম। ঐ কিশোরের কাছে রক্ষিত আমানতগুলো নিয়ে পূর্বপথে রওয়ানা হলাম। প্রথমে বড়লেখা তারপর কুলাউড়া পৌঁছলাম। ততোক্ষণে এশার ওয়াক্ত হয়ে গেছে আদায় করলাম এশার নামাজ। হোটেলে রাতের আহার সেরে চলে এলাম রেল স্টেশনে। প্রায় ঘন্টা তিনেক অপেক্ষা করার পর রাত একটার সময় আমাদের ট্রেন ঢাকার উদ্দেশ্যে কুলাউড়া ত্যাগ করলো। বাতায়নের পাশে বসে মুক্ত আকাশের দেদীপ্যমান তারকা রাজির দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনের কোনায় ভিড় জমাতে লাগলো ফেলে আসা নানা স্মৃতি। মনের অজান্তেই আওড়াতে লাগলাম -" সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল অ'লাল্লাযি খালাকা ফাসাওয়া আল্লাযি কাদ্দারা ফাহাদা..... ।

রক্তে লেখা নাম

আল মুফাক্কির

বিষাদ! অন্তর্ভেদি বিষাদসুর! প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ইথারে-পাথারে। পাহাড়-পর্বতে। ঝোপ-ঝাড়ে। তরু-তলায়। গাছের পাতায়, কান্ডে-শাখায়। মরুর তপ্ত বালুকায়। রুদ্র প্রকৃতির মাঝে। মুহূর্তেই ভেসে গেছে দূর দূরান্তে। এই বিষাদ লেগেছে পুষ্প-পল্লবে। কোকিল-পাপিয়া বিহঙ্গের কণ্ঠে। পালিত অশ্ব, উট, ভেড়া দুম্বা ও বকরী ছানার চলনে-বসনে। বুনোদের পাতায় পাতায়। গুহায় গুহায়। জলজের বিস্তৃত বিশাল রাজ্যে।

নীরব কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে চন্দ্র-সুর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, ধুমকেতু গ্যালাক্সী-নীহারিকা। আকাশ। পৌঁছে গেছে সপ্তাকাশে সিদরাতুল মুনতাহার উপরে। কেঁপে ওঠেছে লওহ ও কলম, খোদ আরশে আযীম।

বেদনায় নীল হয়ে গেছে গাঢ় সবুজ, শ্যামল। শুভ্র হলুদ-বর্ণ বিহীন। বকুল-চাপা, জুঁই চামেলী গন্ধহীন, শুকিয়েছে কামিনী মাধবী। ঝরেছে বুঝি বসরার গোলাপও। ভ্রমরের গুঞ্জন,ফড়িং-প্রজাপতির লুকোচুরি থেমে গেছে। দজলা, ফুরাত-নীলের জলধারাও হয়ত স্থির । শোকার্ত। অশ্রুর বান ডেকেছে নয়নে নয়নে। ভীড় জমেছে স্বজনের; সমুহ মানুষের। রক্ত-লেখার পাশে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠীয়। নিথর নিস্তব্দ। রা-নেই, শব্দ নেই।

শুধু দেখছে এই রক্ত লেখা। ধুসর মরুপ্রান্তরে লেখা, ইতিহাসের সোনালী পাতায় লেখা। মহা যায়না যে লেখা। দেখছে সবাই। নীর ঝরছে মর্মদাহে অঝোর ধারায়, অবিরাম।

রক্তের টানে ছুটে এলেন সাফিয়া। এতক্ষণ সাকী ছিলেন। আপন-প্রতিবেশী-পরিচিতদের। স্বামী-সন্তান ভাইকে চোখে চোখে রাখছিলেন। আবেগ উচ্ছাসে মেতে ছিলেন। তাদের দক্ষতায় সাহসে ছিলেন বিমোহিত।

ভীড় ঠেলে গিয়ে দেখেন ভাইয়ের লাশ। নাক-কান কাটা। নাভী এফোঁড়-ওফোঁড়। বক্ষ বিদীর্ণ। কলিজা ছিড়ে ফেলা। বিভৎস, বিবর্ণ। তাজা রক্তে জমে গেছে মরুর বালি রাশি। গড়িয়ে পড়ে তার লোচন সলীল। সিক্ত হয় সাফিয়ার কপোল-ওড়না-জামা। তবু বলে-এ আর তেমন কি? সবই দ্বীনের জন্য। (শত্রুরা উল্লসিত হোক, বেহুলা বাজাক) আমি সহিষ্ণু।

ঘরে ফিরে দু'টি চাদর পাঠালেন ভাইয়ের কাফনের জন্য। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেন। ভ্রাতৃত্বের টানে, রক্তের ভালবাসায়। হাজারো স্মৃতি ভেসে বেড়ায় তার হৃদয় মানসপটে। একজন মহামানব, শ্রেষ্ঠ মানব বলেন– সাফিয়া যদি তার ভাইয়ের বিভৎস পরিণতি দেখে কষ্ট না পেত, তাহলে আমি এ লাশ দাফন করতে দিতাম না। পড়ে থাকত রনাঙ্গনে। তাকে খেয়ে ফেলত শৃগাল-কুকুর, বাঘ-ভল্লুক। জীব-জন্তু। রোজ হাশরে আল্লাহ ঐ সব জানোয়ারের পেট থেকে তার দেহাংশ বের করতেন। জীবীত করতেন। কে? কে এই আত্মত্যাগী? বীর বিক্রম। নিবেদিত প্রাণ। দ্বীনের তরে। ইসলামের কল্যানে ? তাকাতে হয় পেছনে।

গহিন অরণ্য। ঘন সবুজ শ্যামল। ধুসর মরুর কোন এক প্রান্তে। নানা জাতের, বর্ণের জীব-জন্তু-পাখীর বসবাস এখানে। সকাল-সন্ধা গোটা এলাকা মুখরিত হয় কলরবে, ঐকতানে। শিকার-প্রিয় লোকদের খুব চেনা এই জায়গা। প্রায় ছুটে আসে শিকারের নেশায়,আসেন হামযাও। সুন্দর, সুদর্শন, সুঠামদেহী। সাহসী, উদ্যমী ,বীর পুরুষ। কোন বাধায় তার গতিরোধ করতে পারেনা। শৈশব থেকেই তরবারী চালানো,তীরন্দাজী, কুস্তিতে পাকা দক্ষ। প্রবল আগ্রহ ভ্রমণে। শিকারের আকর্ষণ সীমাহীন। বড় সম্ভ্রান্ত। উচ্চ বংশের ছেলে। রাজপুত্রের মতই অনেকগুলো বসন্ত কেটে যায় তার জীবনে। চিন্তহীন ভাবনাহীন। উল্লাসে, উচ্ছাসে।

আজও এসেছেন এখানে। তিনি। ঐ নেশার টানে। সময় বয়ে যায় অনেক। অবিশ্রান্ত হয়ে ফিরছেন শিকার থেকে। একদিকে শিকারের ক্লান্তি, অবসাদ। অপরদিকে মরুর সূর্যের তাপ-দাহ। উত্তপ্ত বালুকারাশী খাঁ-খাঁ করছে। চারদিকে যেন অগ্নিকুন্ডলী। পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। সব। মাথা ফেটে যাবে, চামড়ায় ফোসকা পড়বে। ঘেমে নেয়ে ওঠেছেন তিনি। চলতে চলতে। তড়িঘড়ি করে আসে একবাঁদী। আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের। পথ আগলে ধরে সাফা মারওয়ার কাছে। বলে দাঁড়াও, আবু আম্মার!

ঃ দাঁড়ালেন শিকারী। শুধালেন-কি ব্যাপার পথ রুখে দাড়ালে কেন?

ঃ ওফ! কি মর্মান্তিক কান্ডই না ঘটিয়েছে আবুল হিকাম।

ঃ খুলে বল-কি হয়েছে?

ঃ তোমার ভাতিজা কা'বা চত্বরে মানুষের সাথে কথা বলছিল, সত্যের কথা, তার মিশনের কথা। আর হিংসুটে, বদের হাড্ডি, পরশ্রীকাতর লোকটা ডাকে যা-তা বকেছে। গালমন্দ করেছে। মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে প্রতিউত্তর-প্রতিবাদ করেনি। ভারাক্রান্ত হয়ে ফিরে গেছে। আজ তার পিতা বেঁচে নেই। থাকলে হয়তো প্রতিশোধ নিত।তাই বলে কি তোমরা চাচারাও সব মরে গেছো!

দাসীর কথায় তিরস্কারে স্নেহের ঢেউ খেলে যায় তার হৃদয়ে। না, এ সহ্য করা যায় না। পিতৃহীন অসহায় বলে তার কেউ নেই? তাকে মারে-কার এত দঃসাহস! যে বকেছে, মেরেছে তার প্রতিশোধ নিতেই হবে

আমার। মুহূত ও বিলম্ব নয়। এক্ষুণি লাফিয়ে ওঠেন ঘোড়ায়। তিনি টেনে দ্রুত হাঁকাচ্ছেন। উল্কাবেগে। খুরের আঘাতে ধুলাচ্ছন্ন আকাশ। থামেননি পথে। জায়গায় মতই পেলেন কমবখতটাকে। স্বজনহারা, ছন্নছাড়া,দুঃখী মানুষটাকে মেরেছে এই পাষন্ডটা। কোন প্রশ্ন নেই। তীর দিয়ে আঘাত করেন তার মাথায়। এক পাশ কেটে গেল। যাক। বনী মাখযুম গোত্রের কিছু লোক,তার দোসর,বদটার পক্ষে লড়তে আসে। হামযা তরবারী ওঠিয়ে ধরেন–"কে আছো, এসো, আমার তরবারী তোমাদেরকে দ্বিখন্ডিত করবে।" এগুতে সাহস করেনি কেউ। স্থির দাড়ীয়ে সবাই। বলে শেষ পর্যন্ত তুমিও! বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে.....? পাগল হয়ে গেলে! তিনি বলেন- তোমরা যখন সত্য বলেই ফেলেছো তাহলে শোন, ঘোষণা করছি- " লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ । যদি সাহস থাকে, সত্যবাদী হও- ফেরাও আমায়।"

দুঃসাহস দেখায়নি কেউ। ঘরে ফিরে এলেন হামযা (রাঃ)। ভাবছেন একি করলাম! ক্রোধ আর উত্তেজনায় বাপ-দাদার মুখে চুন-কালি দিলাম। অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন সারাক্ষণ। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয় ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। অস্থিরতায় ঘুমোতে পারেননি সারারাত। দৌড়ে গেলেন ক'াবার কাছে। গিলাফে ধরে কাঁদছেন– হে ক'াবার মালিক! কি করেছি জানিনা, তুমি আমাকে সত্য পথের দিশা দাও। সংশয়-সন্দেহ কেটে গেল পরক্ষণেই। দৃঢ় প্রত্যয় আর প্রশান্তিতে ভরে গেল অন্তর। এতিম মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়াত পেয়েছেন ক'বছর আগে। দাওয়াত দিয়েছেন মক্কার অলীতে-গলীতে। সাড়া মেলেনি তেমন। বিষন্ন-অবসন্ন হয়ে ঘরে ফিরছেন প্রতিদিন। মুখ-ফিরিয়ে নিয়েছেন চাচা হামযাও। কিন্তু আজ! সোজা চলে গেলেন দারুল আরকামে ব্যক্ত করলেন পোড়া মনের বিষাদ। প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে। অত্যন্ত প্রীত হলেন, খুসী হলেন তিনি দোআ করলেন তার জন্য।

ইসলামের দুর্দিনে হামযার পর মুষ্টিমেয় মুসলমানদের সাথে যোগ দেন বীর বিক্রম উরম (রাঃ)ও। তাদের দু'জনের ইমলা গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি হয়। মানুষের মুখে রব ওঠে এখন আর মুহাম্মদ (সাঃ) কে কিছু করা যাবেনা।

নবুওতের ত্রয়োদশ বৎসর হামযা (রাঃ) হিযরত করেন মদীনায় সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্রে। দ্বিতীয় হিজরী মুসলমানদের প্রতিঘাত করতে আসে কাফেরদের সশস্ত্র বাহিনী। মুখোমুখি হয় বদর প্রান্তরে। কাফের-মুসলমানদের তুমুল যুদ্ধ হয়। দ্বিপক্ষীয় সৈন্যরা কাতারবন্দী হয়ে দাড়ায়। কুরাইশদের পক্ষে উৎবা, শাইবা, ওয়ালীদ। মুসলমানদের পক্ষে ক'জন আনসার যুবক। উৎবা চেচিয়ে ওঠে–মুহাম্মদ! আমরা এদের সাথে যুদ্ধ করবোনা। আমাদের সমকক্ষ কাউকে পাঠাও। হুজুর (সাঃ) এর নির্দেশে হামযা (রাঃ), আলী (রা), ওবাইদা (রাঃ), এগিয়ে এলেন বীরদর্পে। যুদ্ধের ক'মুহুর্তে পরেই হামযা (রাঃ) উৎবাকে জাহান্নামে পৌছে দিলেন আর আলী (রাঃ) পৌছালেন শাইবাকে আর উবাইদা (রাঃ) ওয়ালীদকে। তুমুল লড়াই চলছে উভয়পক্ষে। মুজাহিদরা ঝাঁপিয়ে পড়েন শাহাদাতের উন্মুক্ত নেশায়। প্রচন্ড আঘাত হানেন বীর হামযা (রাঃ), উট পাখীর পালক তার পাগড়ীতে। নজর পড়ে যায় সকলের। উমাইয়্যা ইবনে খালফ্ বলে– উটের পালক মাথায় লোকটি আমাদের সর্বনাশ করছে।

এ যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি মুছতে পারেনি কুরাইশরা। হিংসা আর প্রতিশোধের নেশায় উন্মাদ হয়ে যায়। তৃতীয় হিজরীতে রওয়ানা হয় মদীনা অভিমুখে। উহুদের পাদদেশে তাদের গতিরোধ করে মুসলিম বাহিনী।

শাওয়াল মাস, অনিবার্য যুদ্ধ বেঁধে যায়। বীর শার্দূল হামযা (রাঃ) গর্জে ওঠেন – ওরে আনমানের অপবিত্র পানির সন্তান, তুই আল্লাহ ও রাসূলের কিরুদ্ধে লড়তে এসেছিস, আয় আমি তোর স্বাধ মেটাবো। নেকড়ের মত ঝাপিয়ে পড়েন সম্মুখ যুদ্ধ আহবানকারীর উপর। খতম করে দেন তাকে। তারপর একে একে ত্রিশ জনকে জাহান্নামে পাঠান। ছত্রভঙ্গ করেন কাফেরদের। তছনছ করেন তাদের বুহ্য।

ইসলামের প্রথম যুদ্ধযাত্রা ও আবওয়ার পতাকাবাহী, বদর প্রান্তরে কাফেরদের সর্বাধিক ক্ষতি সাধনকারী এই হামযা (রাঃ) এর রক্ত পিয়াস ছিল কাফেরদের অত্যধিক। তিনি বদর যুদ্ধে জুবাইর তুযাইমকে হত্যা করেছিলেন,তাই জুবাইর তার ক্রীদাস ওয়াহশীকে নিয়ে এসেছে, শুধু হামযা (রাঃ) হত্যা করার জন্য। আযাদ করার শর্তে। সুযোগ-সন্ধানী ওয়াহশী একটি পাথরের পিছনে ওঁৎ পেতে বসেছিলেন, হামযা (রাঃ) যখন পাথরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ওয়াহশী একটি তীর নিক্ষেপ করে। তীরটি হামযা (রাঃ) এর পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। সেখানেই তিনি শাহাদাতের সূধা পানে ধন্য হোন।

কুরাইশরা মহিলারা শুনে আনন্দগীত ধরে। নাক,কান কেটে দেয়। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা। পেট, বুক চিরে কলিজা বের করেও চিবায় সে। সংবাদ শুনে বাঁধভাঙ্গা কান্নায় ভিজে যায় নবীজী (সাঃ) এর শশ্রু মোবারক। বলেন– হামযার কোন অংশ জাহান্নাম স্পর্শ করবেনা। – হে হামযা ! তুমি সাইয়িদুশ-শুহাদা (শহীদদের নেতা)। তুমি ছিলে আত্মীয়তা রক্ষায় অধিক সচেতন। অতিশয় সৎকর্মশীল। সে দিন আমার পক্ষে তুমি আবু জাহেলের উপর প্রতিশোধ নিয়েছ। আজ আমি ওয়াদা করছি– তোমার বদলায় আমিও কাফেরদের সত্তনজনকে কতল করব। নাক, কান কেটে দিব। তেমনি তা নিষেধ করে ওহী অবতীর্ণ হয। খারায ইবনুল আরাতের লাশ পড়েছিল হামযা (রাঃ) এর পাশেই । তার বোন সাফিয়ার প্রেরিত কাফন দু'টি তারক একা দেয়া গেলনা, ভাগ হয়ে গেল দু'জনার মাঝে। কিন্তু হামযা (রাঃ) কে দেয়া চাদরটি দ্বারা তার পুরো শরীর ঢাকা সম্ভব হলোনা। চাদরটি মাথার দিকে টেনে ইজফির পাস দিয়ে ঢাকতে হলো তাঁর পা।

মাদক দ্রব্যগ্রহণের অপরাধ

ধারা- ১৭১ ঃ মাদকদ্রব্যের সংজ্ঞা ঃ

(ক) যে সকল বস্তু সেবনে মাদকতা সৃষ্টি হয় এবং যা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির উপর ক্ষতিকরপ্রভাববিস্তারকরে তাকে "মাদক দ্রব্য"(খাম্‌র) বলে।

(খ) যে সকল বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে এবং যা সেবনে বোধ শক্তি হ্রাসপায় ওসবের সকল শ্রেণীই মাদক দ্রব্য 'খাম্‌র' এর অন্তর্ভূক্ত ।

বিশ্লেষণ ঃ

মাদকদ্রব্যের আরবী প্রতিশব্দ খাম্‌র- অর্থ "সমাচ্ছন্ন করা" ঢেকে ফেলা বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে ক্ষতির কারণ হওয়া । এই সকল অর্থের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণেই 'মদ' বা 'শরাব' কেও খাম্‌র বলা হয় । খাম্‌র শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক ।

ধারা– ১৭২ঃ মাদকদ্রব্য সেবন দন্ডনীয় অপরাধ

(ক) মাদকদ্রব্য সেবন "হারাম" এবং যে নেশাকর দ্রব্যর অধিক পরিমান পান করলে মাদকতা সৃষ্টি হয় তা অল্প বা অধিক পান করাও "হারাম" ।

(খ) মাদকদ্রব্য গ্রহণের শাস্তি সবোর্চ্চ "৮০" বেত্রাঘাত। আদালত বিবেচনা করলে শাস্তির ধরণ ও মাত্রার পরিবর্তন করতে পারে ।

(গ) মাদকদ্রব্য উৎপাদন, পরিবহণ, ক্রয়-বিক্রয়, আমদানী-রপ্তানী পরিবেশন ও উপঢৌকন প্রদান দন্ডনীয় অপরাধ এর শাস্তি আদালত নির্ধারণ করবে ।

বিশ্লেষণ ঃ

মদ্যপান ছিল তৎকালীন আরবের তথা গোটা পৃথিবীর মানুষের সাধারন অভ্যাস এবং তারা মদপানকে অপরাধ যোগ্য কাজ মনে করত না কিন্তু ইসলামে মদ্যপান একটি দন্ডনীয় অপরাধ । তবে মানুষের এই চিরাচরিত অভ্যাসের পরিবর্তন সাধনে ইসলাম ধীর পদক্ষেপে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়েছে । প্রথমে বলা হয়েছে যে খেজুর ও আঙ্গুর হতে মদ প্রস্তুত করা হয়, এবং উওম খাদ্যও (নাহল-৬৭) অতঃপর মদ্যপান করে মাতাল অবস্থায় নামায পড়তে বারণ করা হয়েছে । (নিসা-৪৩) অতঃপর বলা হয়েছে – মদের উপকারী ও অপকারী উভয় দিকই রয়েছে তবে উপকারের তুলনায় অপকারের মাত্রা অধিক (কাহ্‌ফ- ২৯৯) অতঃপর নিম্নোক্ত আযাতে চুড়ান্ত ভাবে এবং চিরকালের জন্য মদ্যপান হারাম ঘোষিত হয় – "ইন্নামাল খাম্‌রু ওয়াল আইসিরু ওয়াল আযলামু বিজসুম মিন আমালিশ শাইত্বণ .....।" অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মুর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য-নির্ণয়ক শরসমূহ ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ । সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদের কে আল্লাহর স্মরণে ও নামাযে বাঁধা দিতে চায় । অতএব তোমারা কি নিবৃত্ত হবে না ?" (মাইদা-৯০-৯১) উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাত্র ক'দিন পূর্বে মহানবী (সাঃ) তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন- "মদ্যপান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ । তা - হারাম হওয়ার নির্দেশ আসা অসম্ভব নয়।"

মহানবী (সাঃ) বলেন–" প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিস হারাম।"

* মাদকতা সৃষ্টি কারী প্রত্যেক বস্তু, মাদকদ্রব্য এবং নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তু হারাম।
* যে পানীয়ই নেশা সৃষ্টি করে তা-ই হারাম ।
* যে জিনিস অধিক পরিমাণ (পান করলে) নেশা সৃষ্টি করে তার স্বল্প পরিমাণ পান করাও হারাম ।
* যে জিনিস এক পাত্র (পান করলে) নেশা সৃষ্টি করে তার এক অঞ্জলী পরিমাণ পান করাও হারাম ।

রাসূল (সাঃ) নেশা উদ্রেককারী এবং নেশার প্রতি আকৃষ্টকারী প্রত্যেক বস্তু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

দায়লাম আলা- হিমায়ারী (রাঃ) বলেন– "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমারা শীত প্রধান এলাকায় বসবাস করি । সেখানে আমাদের কঠোর প্ররিশ্রম করতে হয়। আমরা আমাদের ক্লান্তি দূর করবার জন্য, শীত নিবারণের জন্য গম হতে তৈরী শরাব পান করে থাকি । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– "নেশার সৃষ্টি হয় কি?" আমি বললাম–" হ্যাঁ"।

তিনি বললেন– " তাহলে তোমরা তা পরিহার কর।" আমি বললাম–"কিন্তু লোকেরা তা বর্জন করবেনা।" তিনি বললেন–"তারা মদ পরিহার না করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।"

* তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়কে অবহিত কর যে, নেশা উদ্রেককারী সব জিনিসই হারাম।

* আল্লাহ তাআলা স্বয়ং অভিসম্পাত করেছেন মদকে, পানকারীকে - এর উৎপাদক ,পরিবেশক, ব্যবসায়ী, ক্রেতা, পরিবহন কারীকে এবং যার জন্য উৎপাদন করা হয় ও পরিবহন করা হয় তাকে ।

কুরআনে মাদকদ্রব্য সেবনের শাস্তি নির্ধারণ করা হয় নাই । মহানবী (সাঃ) ও সুনির্দিষ্ট ভাবে এর শাস্তি নির্ধারণ করে দেন নাই । আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন–" মহানবী (সাঃ) এর নিকট এক মদ্যপায়ীকে আনা হলে তিনি বলেন কেউ তাকে জুতা দিয়ে পেটাও। রাবী বলেন– " আমাদের কেউ তাকে হাতে আর কেউ পাকানো কাপড় দ্বারা তাকে প্রহার করেছিল।"

আনাস (রাঃ) বলেন– " রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাদকদ্রব্য গ্রহনের অপরাধে লাঠি ও জুতা দ্বারা প্রহার করেছেন আর কাকর (রাঃ) চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন এবং উমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের শেষ দিকে তা তিনি ৮০ বেত্রাঘাতে উন্নিত করেছেন।"

কাতাদাহ (রাঃ)বলেন– মহানবী (সাঃ) লাঠি ও জুতা দ্বারা চল্লিশবার প্রহার করেছেন।" আনাস (রাঃ) বলেন–" মহানবী (সাঃ) দুটি লাঠি একত্র করে চল্লিশবার প্রহার করেছেন । উসমান ইবনে অফ্ফান (রাঃ) এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি এক মদ্যপান বিরুদ্ধে সাক্ষীদিল যে সে তাকে বমন করতে দেখেছে । ওসমান (রাঃ) আলী (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য । তাকে চল্লিশ বেত্রাঘাত দেয়া হলে আলী (রাঃ) প্রহারকারী কে আনতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন– " মহানবী (সাঃ) চল্লিশ বেত্রঘাত করেছিলেন । আবু বকর (রাঃ) চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন এবং উমর (রাঃ) আশি বেত্রাঘাত করেছেন,সব গুলোই সঠিক (সুন্নাত) এবং আমার পছন্দনীয়।"

মুআবিয়া (রাঃ) বলেন-" রাসূল (সাঃ) বলেছেন -লোকেরা প্রথমবারের মত মাদক দ্রব্য সেবন করলে তাদের কে বেত্রাঘাত কর, পুনরায় (.....চতুর্থবার) সেবন করলে হত্যা কর।" মহান আল্লাহ বলেন–" সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা পরস্পরে সহযোগিতা কর এবং পাপাচার ও সীমালংঘনে পরস্পরে সহযোগীতা করিওনা।" (সুরা মাইদা আয়াত-২)

মহানবী (সাঃ) বলেন–"নিশ্চয় আল্লাহ মদের ব্যাবসা হারাম করেছেন।" যে মহান সত্তা মদ্যপান নিষেধ করেছেন তিনিই ইহার ব্যবসা এবং ইহা হতে প্রাপ্ত মূল্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।

মাদক দ্রব্য গ্রহনের সর্বোচ্চ শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত। অবশ্য ইমাম শাদী ও আহমদ (রহঃ) এর প্রসিদ্ধ মতে ৪০ বেত্রাঘাত ও অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী আদালতের সুবিবেচনায় শাস্তির পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। যেমন কারাদন্ড, অর্থদন্ড ইত্যাদি। তবে বেত্রাঘাত ৮০ এর অধিক বৃদ্ধি করা যাবে না। চতুর্থবার মাদক দ্রব্য গ্রহনের অপরাধে মৃত্যুদন্ডের যে কথা হাদীসে উল্লেখ আছে তা ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কীকরণের জন্য। মাদক উৎপাদন বাজারজাতকরণ, পরিবহন, পরিবেশন এবং আমদানী রপ্তানী দন্ডনীয় অপরাধ। এসব কাজে লিপ্ত অপরাধী আদালতের সু-বিবেচনা অনুযায়ী দন্ড যোগ্য হবে।

ধারাবাহিক উপন্যাস

ফুলশয্যা নয় ক্লাশিনকভ

দারাজদিল

ছেলের পড়া -লেখার খরচ যোগাতে ত্রুটি করেনি মুআনের বাবা। জমি জমা বন্ধক রেখেও টাকা দিয়েছেন। ধার কার্য করেছে অনেক। শোধ করতে যেয়ে শেষ পর্যন্ত টিনের ঘরটা হয়েছে বেড়ার-কুঁড়ে ঘর।

ঐ বছর অক্টোবরে তার মাস্টার্স (ইসলামী) ফাইনাল পরীক্ষা হয়। বছরের মাঝে দেয় উচ্চ মাধ্যমিক সাধারণ বিভাগে। উপরন্ত ছোট বোন সায়মার বিয়ে হয় ঐ বছরের শুরুতে। খরচ যোগাতে গিয়ে তার কুল কিনারা করতে পারে নাই।

তারপর থেকে প্রতি বছরই ঘরের চাল একবার নবায়ন করতে হতো। দু'বছর ধরে তাও আর সম্ভব হয়না। জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। পঁচন ধরেছে বাঁশে। উই পোকা খেয়েছে বেড়া। একেবারে নড়বড়ে, জীর্ণ-শীর্ণ। বাইর থেকে ভিতরে সবই দেখা যায়। অনায়াশেই বেড়াল-কুকুর আসে যায়। বেড়ার বড় বড় ফাঁক দিয়ে সূর্য উত্তাপ ছড়ায়। বর্ষার দিনে বৃষ্টি ঝরে অনবরত। ছেই আসে চারদিক থেকে। ভিজে শ্যাতে শ্যাতে হয়ে যায় ভীটে। শীতের প্রকপেও তাদের রক্ষা নেই। ক্ষান্তহীন তুষারপাত আর প্রচন্ড শীতপ্রবাহে কাঁপে থরথর। দামী কম্বল, কার্পেট, তোষক, চাদরও নেই ঘরে। দু'টো কাঁচের বাসন একটা গ্লাস ছিল মাত্র। বাসন দু'টো ভেঙ্গেছে বিড়াল-কুকুর লড়াই করে। আর গ্লাসটা ভেঙ্গেছে জিদ্দি মেয়েটা, সর্বকনিষ্ঠা নাবিলা। মাটির হাড়ি বাসন-কোসনই তাদের প্রধান ব্যবহার্য্য। তবু তাদের মনে দুঃখ-কষ্ট নেই। একটি মাত্র ছেলে আজ বড় আলেম। ভাল হাফেজ। আমলে ও বাহ্যও পিছিয়ে নেই। আল্লাহর কাছে এই মুনাজাতই ছিল নিত্যদিন। তাহাজ্জুদ শেষে নিশীথ আঁধরে , নিজন নিভৃতে কত কেঁদেছে , কত মিনতি করেছেন বাবা- মা মালিক কে । "হে প্রভূ। তুমি আমার ছেলেটাকে বড় আলেম বানাও;মুত্তাকী , পবহিযগার বানাও! আর যেভাবে আমারে রেখে তুমি খুশি হও-রাখো" তবু মাঝে মাঝে যখন মনটাভার হয়ে যেত, বিষন্ন চেঁপে বসতো। শান্তনা পেতো কুরআনের আয়াত মনে করে । শুনেছিলাম জুম্মা বারে মসজিদের খতীব সাহেবের মুখে – "ওয়ালা নারলআন্নাকুম বিশাইরিম মিনাল যাওফি ওযাল জুঈ ওয়া নাক্সিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আন্‌ফুসি ওযাছ্ছামারাত ; ওযা বাশ্‌শি বিদ দাবিরীন---" (এবং অবশ্যই আমি তোমাদের কে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়- ক্ষুধাম মালও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে , তবে সু সংবাদ দাও সবরকাকারীদের - যখন তারা বিপদে পতিত হয় তখন তারা বলে , নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো

তারপর খতীব সাহেব বলেছেন - "সবর" এর তিনটি শাখা **এক.** নফসকে হারাম এবং না- জায়েয বিষয়াদি থেকে বিষত রাখা । **দুই.** ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা । **তিন.** যে কোন বিপদে সংকটে ধৈর্য্য ধারন করা । আর্থাৎ বিপদ - আপদগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মানা এবং বিনিময়ে তার প্রতিদানের আশা করা ।

এসব ভেবে প্রাণ শক্তি ফিরে পায় খেটে খাওয়া- মেহনতি মানুষটা ইবাদতে দৃঢ় হয় ,প্রফুল্ল হয় তার স্বচ্ছ নির্মল অন্তর । বলে- প্রভূ হে! তুমি আমার করুণাকরে আমায় মানুষ বানিয়েছো; এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কি? প্রশান্তিতে ভরে যায় তার কোমল প্রাণ । নিমিষেই কষ্ট ,ক্লেশ, ক্লান্তি শান্তি ম্লান হয়ে যায় । ক্ষীণ সুখ বুকে কাঁধে । একদিন কপাল খুলবে । ছোট হলেও এক্‌টা নকরী , একটা খেদমত জুটলেই হল মুআনের । কাল না হয় পরশু - ভাগ্য ফিরবে একদিন । জীবনের বাঁকী দিন কটা হয়ত সচ্ছিতেই কাটবে ইবাদত, বন্দেগী বরবে পরিতৃপ্তি সহকারে ।

তিন

সময়ের আবর্তে পেরিয়ে যায় আরো দুটি বছর । ইতিমধ্যে ঠিকই একই একটা নক্‌রী জুটিয়ে নেয় মুআন । বড় কষ্টে, অনেক ভোগান্তির পরে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে। সে বড় আলেম হলেও অন্য দশজন আলেমের মত দ্বীনের খেদমত কে , কুরআন- হাদীসের অধ্যাপনা কে জীবিকা নির্বাহের পেশা বানায়নি। অবশ্য দ্বীনের তা'লীম-অধ্যপনা একেবারে ছেড়ে দেয়নি। পাশেই এক মাদ্‌রাসায় দু'চারটা দরস্ দেয় নিয়মিত। তবে খনিকটা পরিবর্তনও আসে তাদের সংসারে। মনে হয় ভাগ্য সুপ্রসন্ন। পুরনো কুঁড়ে ঘরটায় আবার টিন লাগায়। দু'টা কামরা বাড়ায়। নলকূপ, গোসলখানা, পাকা শৌচাগারও করে। কিছুটা সস্থিতেই কাটে প্রায়। বছর -দেড়। এর পরই জীবন নদীর জলবাশি কুলে ফেঁপে উঠে। সহসায় শুরু হয় জ্বলোচ্ছাস, খরায় পুড়ে ভস্ম-প্রকৃতি হয় আরোও এলোমেলো এ্যাবড়ো-থেবড়ো। প্রধান শিকার হয় মুআনই।

শুক্রবার সহ তিন দিন বন্ধ করে শনিবার অফিসে যেতেই মাথায় ভাঁজ পড়ে। হাত-পা ঘামতে শুরু করে। চোখ চড়কে উঠে। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে যায়। মনে হয় পায়ের তলা থেকে মাটি কিছুটা সরে যাচ্ছে। কি ব্যাপার আমার চেয়ারে ----------?

বুঝে উঠার আগেই পিয়ন এসে সালাম ঠুকে – " মুআন সাহেব ! নিন স্যারের চিঠি।" বলেই একটা খাম হাতে তুলে দেয় । ঝটপট একদমে পড়ে ফেলে মুআন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে যায় । আগে কোন নোটিশ নেই, হঠাৎ এভাবে রেড সিগ্নাল । ভেবে পায়না কিছুই। আশায় গুড়েবালি পড়ে তার। কাউকে কিছু বলতে পারেনা। বেরিয়ে আসে সেখান থেকে। মর্মাহত হয়ে। মন্থর পায়ে হাঁটে। ফুটপাত ধরে। দুশ্চিন্তা চাপে মাথায়। জ্ঞান-বুদ্ধি ঘুর-পাক খায়। ব্যথায় ঘুর-পাক খায় মাথা। দু'টাকার বাদাম কিনে চিবুতে থাকে ওস্মানী উদ্যানে। দেখে শত রঙের, হাজারও ব্যস্ততার মানুষ। এক কাপ চা-ও পান করে। তারপর যায় এক বন্ধুর বাসায়। না পেয়ে ফিরে আসে নিজ মেসে। অন্যান্য সাথীরাও এখানে নেই। যে যার কাজে বেরিয়েছে। আউয়াল ওয়াক্তে জোহরের নামাজ পড়ে সে। তারপর বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি করে আসর পর্যন্ত। ঘুমুতে পারেনা শত চেষ্টা করেও। তারপর বই নিয়ে বসে। মন বসাতে পারেনা কিছুতেই। মাগরিবের নামাজটা জামাআতের সাথে আদায় করে লিখতে বসে কিন্তু কলম চলেনা এক হরফও। যা হোক এশার ওয়াক্ত হয়ে যায়। অন্য সাথীরা ফিরেনি তখনও। মুআন এশা পড়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে বেরিয়ে পড়ে। আবারও হাঁটে ফুটপাত ধরে। মাথায় শত চিন্তা ঘুর-পাক খাচ্ছে। পূর্ব নোটিশ ছাড়াই এভাবে চাকুরিচ্যুতি!

ভাঙ্গা সংসারের হাল ধরতেই আবারও ভেঙ্গে গেল! অংক মেলেনা। খুঁজে পায়না অন্তর্নিহিত কারণ।

রাত প্রায় তিনটা। বিষন্ন চিত্তে অবসন্ন হয়ে ঘুরে ফিরছে ঠিকানাবিহীন ভাবে। ক্লান্ত কদম আর চলেনা। তবুও অন্তত বাকি রাতটা কোথাও পার করতে হবে।

সারা নগরী ঘুমে বিভোর । পথচারী নেই কোথাও। গাঁয়ের মতো ঝিঁ-ঝিঁ পোকারা এখানে ডাকেনা। জোঁনাকীর আলো জ্বলেনা। হঠাৎ হঠাৎ দু'একটা গান্ধি পোকা দুর্গন্ধ ছড়ায়। দূর থেকে লক্ষ করে মুআন দেখতে পায় একটি বিশতলা টাওয়ারের ছাদে লাল কতগুলো বাতি জ্বলে। সে ভাবে সম্ভবত কোন গার্মেন্টস্ হবে। হয়তো ওখানে শ্রমিকরা ওভারটাইম ডিউটি করছে। মুআন আপন মনে বলে– হে করুনার আধার, বিশ্ব চরাচরের একচ্ছত্র মালিক! আমিতো তোমার কাছে এতবড় বাড়ি, দামী গাড়ি কিছুই চাইনি। শুধু সাদা-মাটা একটি পরিচ্ছন্ন চেয়েছি মাত্র। তবে তুমি যদি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকো– আজও আমার কোন আফসোস্ নেই।

হঠাৎ শুরু হয় ঝঞ্জা বায়ু। ধূলি-বালি আর পরিত্যক্ত কাগজে ছেয়ে যায় চারদিক। সামনে বাড়তে পারেনা একদমও। ক'মিনিট পরেই ঝেপে আসে বৃষ্টি চলে যায় বিদ্যুৎ। ক্রমশ বাড়তে থাকে বৃষ্টি। ক্ষণে ক্ষণে হয় বজ্রপাত। দৌড়ে গিয়ে মুআন আশ্রয় নেয় একটা দোকানের সানসেটের সামনে। বাতাসের শোঁ -শোঁ শব্দ আর মেঘের বিকট গর্জনে মুআন দুআ পড়তে থাকে–" আল্লাহুম্মা সাইয়িবান নাছিয়া; আল্লাহুম্মা সাইয়িবান নাছিয়া"

এভাবেই কেটে যায় ঘন্টা দেড়। মুআনের সময় যেন কিছুতেই কাটছেনা। একের পর এক বিপদ লেগেই আছে। ভাবে এ কোন্ দাবা খেলায় পড়েছি, সবকিছুইতো আল্লাহর হাতে। কিন্তু এভাবে চাকরিচ্যুতির বাহ্যিক হেতু কি?

কাজটা কি জামাল সাহেবের? সেদিন তাকে দু'চারটা ধর্মের কথা শুনিয়েছি, ছোট হয়ে জ্ঞানের কথা বলেছি তাই! না-না তা হবে কেন? তিনি তো ধার্মিক মানুষই। নিয়মিত তাবলীগ করেন, চিল্লা লাগান। টুপি,দাড়ি. পাগড়ী-সুন্নতি লেবাস তার পুরোই আছে। আমার এতটুকু বলার জন্য তিনি একাজ করতে পানেনা। আমি তেমন আর কি বলেছিলাম! তিনি জেনে বুঝেও যখন সরকারী চাকরি করে ঘুষ গ্রহন করেছেন। আবার তাকে মানুষের হাদিয়া, উপহার উপঢৌকন বলে জায়েয করতে চেয়েছেন তখন আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম মাত্র- আর রাশি মুরতাশি কিলা হুম্মা ফিন্নার– ঘুষ দাতা আর গ্রহিতা উভয়ই নরকাগ্নিতে জ্বলবে। সে জন্য তিনি আমার উপর এত বড় অন্যায় করতে পারেনা! কিন্তু------? তবে কি নাজনীনের বাবা----? না, তাও হতে পারেনা! আমি তো তাদের কোন ক্ষতি করিনি যে, তিনি একাজ করতে যাবেন! কিছুতেই অংক মেলেনা তার! একের পর এক ভুল অংক কষতে কষতে ভোর হয়ে যায়। বাস্তবতায় ফিরে আসে মুআন। জামা-কাপড়, কাদা-বালিতে ভর ,ভিজে এখন শুকিয়েও গেছে বৃষ্টি কখন থেমেছে টের পায়নি। একটা রিক্সা করে দ্রুত মেসে চলে আসে তখন অন্যান্য সাথীরা যার যার কাজে চলে গেছে। মুআন ফ্রেস হয়ে জামা- কাপড় পাল্টিয়ে রওয়ানা হয় নিজ গ্রামে । তাদের থানার মোড়ে গিয়ে বাস থামে। মুআন বাস থেকে নেমে দশ-পনের কদম হাঁটতেই তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এক অজ্ঞাত পরিচয় লোক। তারপর বিশ কদম হাটতে শুনে পিছু ডাক ঘুরে দাড়ায় মুআন, তাকে ঘিরে ধরে চারজন পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই নিয়ে যায় থানায়।(চলবে)

অনুভবে

–মাহদী হাসান

শয়নে স্বপনে নিশীথে জাগি
অনুরাগে অনুভবে অনুক্ষণ
কাহারি লাগিয়া দগ্ধ হয়
নিত্য ধূসর এই তনু-মন!!
জানেনা-সুহৃহে সাদিক
কোথা বিমল প্রভাত,
ভুলিয়াছে দুপুর সন্ধাও
হেরিয়া কী জল-প্রপাত!!
হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া ওঠে যে,
সুর বিষন্ন,ক্ষীণ ঝংকার
সুখ-বাঁশরী, অনুঢ়ার কংকন
না প্রলয়-ধ্বনী শঙ্কার!
কিছুই জানিতে চাহেনা কভু
চাহেনা বুঝিতে সে আত্মভোলা,
সুরাইয়া তারাও বিজিবে ত্যাগিয়া,
নাশিয়া যত ঘাত ও গোলা।
মোমের মত জ্বালিবে জানিও,
থাক সে নিজেই আঁধারে!
কসম ইলাহ্‌র ওগো মহিয়সী,
নহে এ গপ্প আষাঢ়ে ॥

ভুলোনা

–শারমীন ওয়াহিদ

নির্জনে একাকি
নিশীথে আঁধারে
একই আরাধনা
বাঁচাও প্রভূ আমারে॥
চারদিকে আবর্জনা
কদর্য কীট বর্জ্যভার
ন্যুব্জ কুব্জ তনু
সহেনা কীট বর্জ্যভার
অসহায় বান্দাতব
মিনতি করে চাহে ক্ষমা
পাপে তাপে দগ্ধ
নাই তার পূণ্য জমা
জীবনের গোধুলী বেলায়
ভুলোনা, ভয়াল দিনে
পুল-সিরাত মিযানে
বেঁধোনা গুনাহ্‌র ঋণে।

প্রার্থনা

–ইলিয়াস বিন আসাদ

স্রষ্টা বলে দিয়েছেন– তুমি মুসাফির
তাঁরই আদেশে দ্যুলোকে এসে
উর্দ্ধলোকে তাকিয়ে দেখি ফির।
পরে শুরু করি একাকী পথচলা,প্রতিক্ষণ,
এ পথের ধারে নাম নাজানা কত কিছু
আর কতনা অজানা জন,
কত বীণা, কত তান বেজে চলে আপনার তালে
কতনা শ্রান্ত পথিক পথ নেয় ঠিক চিনে
এ পথের মাঝে আবার কখনও
স্মৃতিগুলো এসে বাসা বাঁধে মন বীণে
মনের গোপন কোণে।
এখনও
আমি বাঁধা হায়! এসবের ঋণে ।
দিন চলে যায় , রাতও চলে যায়–অজানা দিনের
খোঁজে,
চেনা মুখও যেন অচেনা হয়ে আসে চিন্তার ভীড়ে
আমি আজও হায় বসে আছি চোখ-বোজে
রিক্ত আমি, শুন্য অসার, তবু চাই যে সবই ফিরে !
পড়ন্ত বিকেলের কোন এক গোধূলির ক্ষণে
জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে আজ–
মাগি ভিক্ষ তব দ্বারে, কাঁদি শুষ্ক প্রাণে
চেয়ে চেয়ে দেখি–
কিছুই জমানো হয়নি জীবনের বেলাশেয়ে।
সবই যেন ফাঁকা রয়ে গেল–
আজ মনে হয়–
শৈশবে কৈশোরে কিংবা যৌবনে
যা কিছু পেয়েছি হায়–
তার কোনটাই স্বচ্ছ হীরা-নয়
পেয়েছি শুধু-সাদা কাঁচ রূপে, ভুল করে।
নয়নে অশ্রু ঝরে তাই ভ্রান্তির ছলে।
কি হীন, নগন্য, তুচ্ছ আমি, আজ আপনাকে নিয়ে
ওগো প্রভূ– ওগো দয়াময় প্রভূ–
আমায় ক্ষমা করো তোমারি ক্ষমার দানে।
সমুখে যেটুকু সময় আরও আছে–
শক্তি দাও, ক্ষমতা দাও–
প্রাণপন যেন তোমায় ডেকে যেতে পারি– প্রতিটি
নিঃশ্বাসে–
প্রভূ –হে,
আমি মুসাফির –চলেছি অনন্ত জীবনের পথে
রুগ্ন-জরাগ্রস্থ কাঙাল ভিখারীর বেশে
তোমার করুণার দ্বারে ঠাঁই দিও মোরে
তোমাতে সমর্পণ করে আপনারে
এ মিনতি করি করজোড়ে ।

আত্-তাহ্‌রীয

মোঃ ফকরুযল ইসলাম

আত্-তাহ্‌রীয তোমায় জানায় আমি
লাখো স্বাগতম,
হাজারো পত্রিকার মাঝে
তুমি হবে অন্যতম।
নিত্য নতুন কথা জেনে
হব লাভবান,
সত্য কথা বলতে তুমি
হও আগুয়ান।
নির্ভীক অগ্রযাত্রায় তুমি
চল এগিয়ে,
দ্বীনী কালামের কথা তুমি
সর্বাদায় নিয়ে॥
হক বাতিলের দাওয়াত তুমি
নিয়ে সর্বদা,
বিশ্ব বুকে এই জামানায়
রাখবে অবদা.....।
সর্বশেষে এই কামনা
–করি তোমার কাছে,
আত্-তাহ্‌রীয তোমায় পাই যেন মোরা
প্রতি মাসে মাসে॥

বাংলা আমার

আহমদ শরীফ ইমন

মাতৃভূমি বাংলা আমার
চির সবুজের দেশ,
মনোলোভা মনোহরী
নাই যে রূপের শেষ।
বাংলা আমার
মায়ের ভাষা,
ফুটাই তাতে
মনের আশা।
বাংলা আমার শুরু
বাংলা আমার শেষ,
আশার প্রদীপ জ্বালবে সে যে
নাই যে তার লেশ।

ধূরন্ধর চেয়্যারম্যান

ধূরন্ধর এক চেয়্যারম্যান। বিগত নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েই এক কুটিল ফঁন্দি আঁটে। সরকারী মন্ত্রনালয়ে অর্থ বরাদ্ধ চেয়ে দরখাস্ত লিখে আমার এলাকার সিংহভাগ মানুষ দরিদ্র, কৃষিজীবী,তারা নানা সমস্যায় জর্জরিত। পানি সংকট এখানে প্রকট। সময়মত সেঁচকার্য সম্পদান করতে না পারায় কৃষি উৎপাদন চরমভাবে ব্যহত হচ্ছে। ফলে এই এলাকার মানুষ অনাহারে অর্দ্ধাহারে প্রতিনিয়ত মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে। এহেন সংকট উত্তীর্ণের জন্য অন্তত একটি নাতিদীর্ঘ খাল/পুকুর খনন বড়ই প্রয়োজন।

সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়। কিছুদিন পর ইনকোয়ারির জন্য সরকারী কর্মকর্তা আসেন। ধূর্ত চেয়্যারম্যান তাকে ভাল-মন্দ খাইয়ে বস করে নেয়। বাঁ হাতের কাজ করে ঐ কর্মকর্তার কাছ থেকে ডান হাতের কাজটা সেরে নেয়। তিনি লিখে দেন–পুকুর খনন কার্য সম্পন্ন হয়েছে।

তার কিছুদিন পর চেয়্যারম্যান মৎস্য মন্ত্রনালয় থেকে পাঁচ লক্ষ বরাদ্দ নেয় মাছ চাষের কথা বলে। এবারও ইনকোয়ারির জন্য জনৈক কর্মকর্তাকে ঘুষ প্রদান করে লিখিয়ে নেয়– মাদবর গঞ্জে বিশাল মাছের খামার করা হয়েছে । এখানে প্রচুর পরিমাণে দেশি-বিদেশী মাছ চাষ করা হচ্ছে।

ততোদিনে চেয়্যারম্যানের ৫ বছরের মেয়াদ প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। তড়িৎ এবার সরকারের নির্দিষ্ট মন্ত্রানালয়ে অর্থ বরাদ্ধ চাইল যে, এই গঞ্জে নির্ধারিত পুকুরটি মানুষের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন প্রকারেই এর পূর্ণ পরিচর্যা নেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। বর্তমানে তা এক নর্দমায় পরিণত হয়েছে এতে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। দূর্গন্ধের কারণে এ গঞ্জ বসবাস অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। তাছাড়া শিশু কিশোরদের মৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই পুকুর। তাই কালবিলম্ব না করে এটা ভরাট করা একান্ত প্রয়োজন।

চেয়্যারম্যানের জোরালো বক্তৃতা ও ঘোর যুক্তির পর বরাদ্দ না দিয়ে উপায় নেই। দু'লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হল। চেয়্যারম্যানের ধারণা ছিল এবার ইনকোয়ারির তেমন জরুরত নেই। আর হলেও সমস্যা নেই। এখানে পুকুরই ছিলনা ভরাট হবে কোত্থেকে কিন্তু বাস্তব হলো তার বিপরিত ইনকোয়ারী এত কড়া হলো যে তার আর দুই নম্বরী করার সুযোগ হলোনা কারণ ইনকোয়ারী অফিসার ছিল অত্যন্ত ভাললোক সে কোন প্রকার ঘুষের টাকা গ্রহণ করলোনা সঠিক ইনকোয়ারীর রিপোর্ট পেশ করলেন । চেয়্যারম্যানের নামে অর্থ আত্মসাধের মামলা হলো । রায় হলো তড়িৎ গতিতে । চেয়্যারম্যানের জেল হলো যাবৎ জীবন । কথায় বলে চোরের দশদিন আর মালিকের একদিন । 'মিথ্যাই' তার ধ্বংসের মূল কারণ। মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে আর সত্য মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে।

হাসবেনা

ক) ভয়ংকর এক জঙ্গীর বাড়ি দরজায় পুলিশ নক করেছে। তার স্ত্রী দেখে দরজা আরোও ভাল করে লাগিয়ে দিয়ে স্বামীকে বলে– প্লীজ আপনি ওদিকে যাবেন না, পুলিশ! জঙ্গী–চুপ, তুই সর! সকালের নাস্তা আইছে খাইয়ালই।

খ) এক সন্ত্রাসীকে ধরার জন্য পুলিশ ফোর্স ধাওয়া করে। অবস্থা বেগতিক দেখে সন্ত্রাসী এলোমেলো দৌড়াতে থাকে। পথ ভুল হয়ে যায়। দূর থেকে কোন বাড়ীর আলো দেখে দৌড়িয়ে যায়। বারান্দায় আঁচড়িয়ে পড়ে চেচিয়ে বলে– কে আছেন, বাঁচাও আমায়।

দু'তিন জন এগিয়ে আসে। জিঙ্গাসা করে –আপনি কে?

সন্ত্রাসী –আমি লেংড়া কামাল।

আগন্তুক– ও আপনি ? আমরা আপনাকেই খুঁজছি।

সন্ত্রাসী– কারা আপনারা?

আগন্তুক– আমি এই থানার ওসি রফিক জামাল । ওরা আমার সহকর্মী।

চিন্তা করে বলনতো

ক) চতূর্ভূজ আকৃতির একটি পুকুর। চার কোনায় চারটি গাছ। পুকুরটি দ্বিগুন প্রসস্ত করতে হবে কিন্তু কোন গাছ কাটা বা উঠানো যাবেনা।

খ) আরবের সেই অতিথি পরায়নতা আজও আছে, না এখন তাদের অন্য পিয়াস?

– বাক্যটি থেকে উল্লেখিত দেশ ভিন্ন একটি দেশের নাম বের করতে হবে।

গ) চাউল নেই, কতগুলো ধানের নাম বল!

শব্দ নিয়ে,ধাঁধাঁ

১			*	২	৯	
	*	*	৮	*		*
	*	৩			*	১১
*	৭	*		*	*	
৪		*	৫		১০	
*	৬		*	*		*

পাশাপাশি ঃ (১) নদীর নাম (২) অনল (৩) নৌ-যান (৪) সকল (৫) নুপুরের ধ্বনী (৬) শায়ের সাহিত্যিক

উপর নিচ ঃ আকাশের হাল (৭) পাঠ (৮) লেখা সংশোধনকারী (৯) দোষ-গুণ (১০) ফলের নাম (১১) দাফনের পূর্বের কাজ।

বিজ্ঞ বচন

Λ প্রতিটি দিনকেই জীবনের শেষদিন মনে কর।

Λ আমল বিহীন ইলম-জ্ঞান, ফল বিহীন বৃক্ষ সাদৃশ।

Λ দ্বীনী জ্ঞান আল্লাহর নূর, তা কোন পাপাচারীকে দেয়া হয় না।

Λ ভদ্রলোক সেই জন – যে সত্যের পথিক, যে মানুষকে সমাদর করে, চরিত্রে মহৎ এবং কাজ যা করে গৌরবময়।

–সাদী

Λ যে প্রতিবেশী তোমার কাছে শান্তি প্রত্যাশা করে তার বিরুদ্ধে তুমি ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়োনা । –সুলাইমান (আঃ)

বাণী

Λ যে ব্যক্তি যার বেশভূষা অবলম্বন করে সে তারই অন্তর্ভূক্ত ।

– মুহাম্মাদ (সাঃ)

Λশ্রমিককে তার ঘাম শুকানেরা পূর্বেই তার পাওনা দিয়ে দাও।

–মুহাম্মাদ (সাঃ)

Λ যে লোক ধৈর্য্য ধরতে পারে, তার জন্য আনন্দ ও প্রশান্তি অপেক্ষা করে।

– জন লিলি

Λ ধনের প্রাচূর্য নয়, হৃদয়ের প্রাচূর্যই প্রকৃত প্রাচূর্য।–

মুহাম্মাদ (সাঃ)

প্রবাদ

Λ ধনের মানুষ অপেক্ষা মনের মানুষই বড়।

Λ ফুলের বাগান সবার মনেই আছে, সবাই ফুল ফোটাতে নাহি জানে।

Λ মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য্য হাসে।

Λ পরের অভাব মনে করিলে চিরন্তন

আপন অভাব ক্ষোভ থাকে কতক্ষণ?

গত সংখ্যার **"বুদ্ধি খাটাও"** এর উত্তর ঃ ক) ভগ্নিপতি (ফুফাতো)

খ) তিন।

গ) নেই, সব ক'টি হাত।

সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

১) **মোসাঃ সালমা আক্তার,**
প্রযত্নে-মুহাঃ কাজী জালালুদ্দীন,
পৈলানপুর,বক্তারপুর, কালিগঞ্জ,গাজীপুর।

২) **মাহবুবুর রহমান,**
৩২,কিশোরগঞ্জ।

৩) **রাজিয়া সুলতানা,**

নলতা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

৪) **রাসেল,**
ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।

৫) **আসাদ,**
বেগুনাই, হবিগঞ্জ।

৬) **ইফতিয়াত,**
পাগলা পাঁচলী,গফরগাঁও, মোমেনশাহী।

৭) **মাসুম বিল্লাহ,**
মিরপুর-১৪, ঢাকা।

৮) **বেলাল হুসাইন,**
পলাশ, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

৯) **সেলিনা আক্তার,**
কক্সবাজার, চট্টগ্রাম।

১০) **বদরুল আলম,**
জামেয়া ইমদাদিয়া, মিরপুর-১২, ঢাকা।

পুরুস্কার বিজয়ী তিনজন

১) **সালমা আক্তার**
প্রযত্নে-কাজী জালালুদ্দীন,
পৈলানপুর, বক্তারপুর, কালিগঞ্জ।

২) **রাজিয়া সুলতানা,**
নলতা, কালিগঞ্জ,সাতক্ষীরা।

৩) **আসাদ,**
বেগুনাই,হবিগঞ্জ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ পুরুস্কার বিজয়ী বন্ধুরা অপেক্ষা করুন। সময়মত আপনাদের ঠিকানায় পুরুস্কার পৌছে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

" কঁচি মনের ভাবনা " এর নতুন সদস্যগণ

(১) **মুহাঃ নজীর আহমদ ইসমাঈল,**
প্রযত্নে-নূরুল ইসলাম,
কাজিপাড়া, মহিচাইল, চান্দিনা,কুমিল্লা।

(২) **সালমা আক্তার**
প্রযত্নে-কাজী জালালুদ্দীন,
পৈলানপুর, বক্তারপুর, কালিগঞ্জ।

(৩) **আসাদ,**
বেগুনাই,হবিগঞ্জ।

(৪) **মোহাঃ মাসুম বিল্লাহ,**
জামেউল উলুম মাদ্রাসা, মিরপুর-১৪, ঢাকা-১২০৬।

(৫) **মাহবুবুর রহমান,**
৩২,কিশোরগঞ্জ।

(৬) **তানিয়া আক্তার,**
৩২,কিশোরগঞ্জ।

(৭) **মোঃ আব্দর রহিম,**
শরহে বেকায়া, ফরিদাবাদ মাদ্রাসা, ঢাকা।

(৮) **মারজানা,**
রিচি, হবিগঞ্জ।

(৯) **সজিব,**
অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।

(১০) **ইফতিয়ার,**
পাগলা পাঁচুলী, গফরগাঁও, মোমেনশাহী।

(১১) **সালমা আক্তার,**
সাতাইশ টঙ্গি,গাজীপুর।

(১২) **মারুফ শেখ,**
সাতাইশ টঙ্গি,গাজীপুর।

(১৩) **বেলাল হোসাইন,**
পলাশপুর, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

(১৪) **ইয়াকুব আহমদ,**
অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।

(১৫) **মনিকা ইয়াসমিন শিল্পী,**
অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।

(১৬) **হাফেজ সাইদুর রহমান,**
মৌবন-৩২,(নিমতলা) ছোবহানীঘাট, সিলেট।

(১৭) **হাফেজ মোঃ আফজাল হুসাইন,**
মোহাম্মাদীয়া শামসুল উলুম কওমী মাদ্রাসা,
শিবচর, মাদারীপুর।

(১৮) **মাহমুদুল হাসান ,**
চিওড়া, আসগারিয়া ফাজিল মাদ্রাসা,
চিওড়া, চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা।

(১৯) **হাফেজ মোঃ মোজাম্মেল হক হেলালী,**
দারুল উলুম কাতিয়া মাদ্রাসা,
সুনামগঞ্জ-৩৩৭৪

সদস্য কুপণ

নাম .....
বয়স ..... জন্মতারিখ .....
পিতার নাম .....
পেশা .....
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম .....
শ্রেণী ..... শাখা ..... ক্রমিক নং .....
গ্রাম
পোস্ট
থানা .....
জিলা .....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর তারিখ

মরোক্কোয় আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৪০ নিহত শতাধিক আহত

মরোক্কোর রাজধানী ক্যাসাব্লাংকায় সম্প্রতি আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ৪০ ব্যক্তি নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছে। অল্প সময় পর পর ৫টি বোমা ক্যাসাব্লাংকার কেন্দ্রস্থলে একটি ইহুদী কমিউনিটি সেন্টার ও ইহুদী কবরস্থান, বেলজিয়াম কনস্যুলেট, একটি স্পেনের রেস্তোরা ও অপর একটি বড় হোটেলে বিস্ফেরিত হয়। এতে অন্তত ১০ জন বোমা হামলাকারীও নিহত হয়।

মরোক্কোর কতৃপক্ষ এই হামলার জন্য আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে দায়ী করে এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে। তবে মরোক্কো এ বোমা হামলার জন্য সরাসরি ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা সংগঠনকে দায়ী করেনি। বিস্ফোরণস্থলগুলোর এখানে সেখানে মানবদেহের টুকরা ও রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

রিয়াদে ৩টি ইঙ্গ-মার্কিন ভবনে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৯১ জন নিহত আহত শতাধিক

গত ১২ মে রাতে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে মধ্য রাতে তিনটি বিদেশী আবাসিক ভবনে ভয়াবহ আত্মঘাতী গাড়ী বোমা হামলায় কমপক্ষে ১২ জন মার্কিন নাগরিক সহ ৯১ জন নিহত হয়। আহত হয় শতাধিক। তার মধ্যে ৪৪ জন হচ্ছে মার্কিন নাগরিক। বিস্ফোরণে ৯টি ভবন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। রিয়াদের স্থানীয় সময় রাত ১১টা ২৮ মিনিটে এ হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা গুলিবর্ষণ করতে করতে আবাসিক ভবনগুলোর ভিতরে প্রবেশ করে এবং বিস্ফেরক বোঝাই ৩টি গাড়ীতে বিস্ফোরণ ঘটায়। পূর্ব রিয়াদে যে তিনটি আবাসিক ভবনে হামলা চালানো হয় সেগুলো হচ্ছে আল-হামরা ও আল-ব্লাইধ ও আলজাদাওয়েল। বোমা বিস্ফোরণে আবাসিক ভবনগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে। এ ভবনগুলোর মালিক হলেন রিয়াদের ডেপুটি গভর্ণর আব্দুল্লাহ আল-ব্লাইধ। তার নামানুসারে এ ভবনের নাম করণ হয়েছিল।

মিঃ বুশ সন্ত্রাসীরদের পাকড়াও করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে হুংকার ছেড়েছেন। এ হামলা এমন সময় হলো যখন মিঃ কলিন পাওয়েল মধ্যপ্রাচ্য সফরে ছিলেন। পুলিশ ১৯ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে খুঁজছে। এ হামলা করার কয়েক সপ্তাহ আগে সৌদি আরব হতে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার করে কাতারে নেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সৌদিআরবে মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করেই ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে সৌদি সরকার এর মত বিরোধ দেখা দেয়। ওসামা বিন লাদেন মার্কিন সৈন্য স্বীয় মাতৃভূমি হতে বিতাড়িত করার জন্য শপথ করেছেন। এটি প্রমাণ করে, সৌদিআরবে মার্কিনিরা নিরাপদ নয়। আত্মঘাতী বোমা মেরে জীবন দিতে যারা ভীত-সন্ত্রস্ত নয় তাদের খতম করা যায়না। আমেরিকার বোমা সে দেশের মানুষকে রক্ষা যে করতে পারে না এটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

চেচনিয়ার রুশ নিরাপত্তা ভবনে আত্মঘাতী বোমা হামলা নিহত ৫০ জন আহ দু'শর বেশি

চেচনিয়ায় সম্প্রতি আত্মঘাতী ট্রাকবোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৫০ জন নিহত এবং দু'শর বেশি লোক

আহত হয়েছে। এ সময় উক্ত ভবনের আশেপাশের আরো চারটি প্রশাসনিক ভবনও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দোতালা ভবনটিতে রাশিয়ার ফেডারেল সিকিওরিটি সার্ভিস ও গোয়েন্দ সংস্থার কার্যালয় ছিল। এই হামলায় সিকিওরিটি সার্ভিস বিল্ডিং, জেলা পুলিশ সদর দপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসনিক ভবন ধ্বংস হয়। উল্লেখ্য যে গত ডিসেম্বরে মরোক্কোর মদদপুষ্ট চেচেন প্রশাসনিক সদর দপ্তরে ট্রাক বোমায় কমপক্ষে ৭০ জন নিহত হয়।

ইন্দোনেশিয়ার আচেহ্‌তে তীব্র লড়াই ১৫০টি স্কুল ভস্মীভূতঃ ১৩ জন নিহত

এপিঃ ইন্দোনেশিয়ার আচেহ্ প্রদেশে ৭মে সেনা অভিযানের তৃতীয় দিনে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে তিব্র লড়ায়ে ১৩ জন নিহত হয়েছে। ফ্রি আচেহ্ মুভমেন্টের মুখপাত্র টেংকু আজাম বলেছেন, উত্তরাঞ্চলীয় আচেহ্ শহর বিরিয়ুনের ২ কিলোমিটার পূর্বদিকে এক লড়ায়ে ১০ বেসামরিক লোকসহ ১৩ জন নিহত হয়েছে। লড়াই শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৫০টি স্কুল ভস্মীভূত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সতর্কতা ঘোষণা

রয়টার্স ঃ মার্কিন সরকার সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে এর সতর্কতা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (অরেঞ্জ লেবেল) পর্যায়ে উন্নীত করেছে এবং মরক্কো ও সৌদিআরবে আত্মঘাতী বোমা হামলার মত মার্কিন ভূখন্ডে এ ধরনের হামলার ঝুঁকি রয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। সাম্প্রতিক গোয়েন্দা তথ্যগুলো পর্যালোচনার পর শীর্ষ জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের একবৈঠকে সতর্কতার মাত্রা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। হেমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারী আসা হাচিনসন বলেছেন, সৌদি আরব ও মরোক্কোতে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলা এবং মার্কিন বিরোধী সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর অভিপ্রায় সংক্রান্ত গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে সতর্কতায় এ পরিবর্তন আনা হয়েছে।

তিনি বলেন, মার্কিন গোয়েন্দা কম্যুনিটি বিশ্বাস করে যে, সন্ত্রাসীরা যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলার পরিকল্পনা করছে এবং এ কারণে সতর্কতার মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কয়েক দিন পূর্বে এফবিআই জানিয়েছিল যে, মরক্কো ও সৌদি আরবে যে আত্মঘাতী হামলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপ হামলা চালানোর একটি পূর্বাভাস। তবে এফবিআই একথা বলেনি যে, সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে তাদের কাছে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ রয়েছে। দেশবাসী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কাছে প্রেরিত এফবিআই'র এ বার্তায় বলা হয়, সম্প্রতি গোয়েন্দা তথ্যগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, সৌদি আরব ও মরোক্কোর আত্মঘাতী বোমা হামলা যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ হামলার একটি পূর্বাভাস হতে পারে। ইরাকে হামলা শুরু হওয়ার আগে মার্কিন সরকার ১৭ মার্চ সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হাম -লার বিরুদ্ধে সতর্কতার মাত্র 'অরেঞ্জ লেবেল' অর্থাৎ সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। এক মাস পর সতর্কতার মাত্রা ইয়েলো লেবেলে নামিয়ে আনা হয়। সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতার মাত্রা হচ্ছে রেড বা সিভিয়ার রিস্ক লেবেল। যুক্তরাষ্ট্রে সতর্কতার মাত্র হচ্ছে ৫টি। গত বছর থেকে ৫ স্তরের এ সতর্কতার ব্যবস্থা করা হয়।

ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আসলেই আছে কিনা সন্দেহ ঃ হ্যান্স ব্লিক্স

এপি ঃ জাতিসংঘের প্রধান অস্ত্র পরির্দক হ্যান্স ব্লিক্স বলেছেন, তার মনে এ মর্মে সন্দেহ দানাবেঁধে উঠেছে যে, ইরাকে আসলে কোন গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে কিনা। তবে তিনি বলেন, তার দল প্রয়োজন হলে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে এবং প্রমাণাদি সংগ্রহের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত। মিঃ হ্যান্স ব্লিক্স বার্লিনের দৈনিক পত্রিকা দার টেজেস স্পাইজেল-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেন। ইরাকের এই অস্ত্র কর্মসূচীর প্রধান লেঃ জেনারেল আমির আল সাদী গত মাসে মার্কিন বাহিনীর কাছে আত্ম সমর্পণ করেছেন এবং তিনি জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন যে তাদের হাতে কোন গণবিধ্বংসী অস্ত্র নেই। মিঃ ব্লিক্স বলেন, সাদীর এই বক্তব্যের পর আমার নিজের মনেই এ ব্যাপারে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে এবং ইরাকের হাতে প্রকৃত পক্ষে গণবিধ্বংসী অস্ত্র না থাকতে পারে।

উত্তর প্রদান ঃ মুফতী শহিদুল ইসলাম, জামেআ ইসলামিয়া নুরুলউলম জিবনতলা,ভালুকা,মোমেনশাহী।

মোঃ সারোয়ার হোসেন,
পত্নীতলা, নওগাঁ,

প্রশ্ন ঃ টয়লেট পেপার দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ মাটির ঢেলা বা পাথর এর ব্যবস্থা থাকা অবস্থায় অন্য কোন ওযর ব্যতীত টয়লেট পেপার ব্যবহার না করাই উত্তম, তবে মাটির ঢেলা বা পাথর এর ব্যবস্থা না থাকলে অথবা অন্য কোন ওযর থাকলে টয়লেট পেপার ব্যবহার করতে কোন প্রকার অসুবিধা নেই।

* ১. আহসানুল ফাতওয়া- খন্ড ঃ ১ম, পৃষ্ঠা ঃ ১০৮
* ২.আল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ-খন্ড ঃ ১ম, পৃষ্ঠা ঃ ৯৮
৩. হাশিয়া ইমদাদুল ফাতওয়া- খন্ড ঃ ১ম, পৃষ্ঠ ঃ ১৩৯

মোসাঃ সালমা আক্তার,
বাগবাড়ী, গাবতলী, ঢাকা।

প্রশ্ন ঃ (ক) মাননীয় মুফতী সাহেব,শারিরীক অসুস্থতার জন্য অপারেশরের মাধ্যমে আমার সন্তান প্রসব হয় এবং যৌনাঙ্গ দিয়ে কোন প্রকার রক্ত প্রবাহিত হয় না যাহা স্বাভাবিক প্রসবে হয়ে থাকে, নামাযের জন্য নিফাসের সর্বনিম্ন সময় অপেক্ষা করতে হবে কি না এবং এই অবস্থায় আমার নামাযের হুকুম কি?

(খ) মাসিক অবস্থায় আয়তুল কুরসী, মুখস্ত কুরআন শরীফ পড়া যায় কিনা?

উত্তর ঃ (ক) না, আপনার অবস্থার প্রেক্ষিতে নিফাসের সর্ব নিম্ন সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কারণ- যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্ত বের না হলে নেফাস বলে গণ্য হয়না এবং এই অবস্থায় আপনার উপর নামাজ আদায় করা ফরজ।

* ১. ফাতওয়া আলমগিরী- খন্ড ঃ ১ম, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭
* ২. ফাতহুল কাদীর- খন্ত ঃ ১ম, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৪

(খ) মাসিক অবস্থায় আল্লাহর ছানা তথা প্রসংসার নিয়ত করে আয়তুল কুরসী পাঠ করতে পারবেন তবে তলাওয়াতের নিয়ত করে আয়তুল কুরসী পাঠ করা যাবেনা।

* তাহতাবী আলাদদুর-খন্ড ঃ ১ম, পৃষ্ঠা ঃ ১৫০

মাসিক অবস্থায় কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা যাবে না।

* হেদায়া- খন্ড ঃ ১ম, পৃষ্ঠা ঃ ৬৪

মাসুদ,
ব্যাংক কলোনী সাভার,ঢাক।

প্রশ্ন ঃ সেজদা রত অবস্থায় উভয় পা উঠে গেলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ কপাল মাটিতে থাকা অস্থায় এক পাও যদি ক্ষণিকের জন্য মাটিতে লেগে থাকে তাহলে সেজদার ফরজ আদায় হয়ে যাবে। তবে পুরো সেজদার পূর্ণ সময়টাতে উভয় পা মাটিতে লাগিয়ে রাখা উচিত। কেননা, ইচ্ছাপূর্বক এক বা উভয় পা ক্ষণিকের জন্যও উঠিয়ে রাখা মাকরূহে তাহরীমি।

* ১. তাহতাবী আলাল মারাকী পৃষ্ঠ ঃ ১৮৬
* ২. আদদুরুল মুখতার (শামী সংযোজিত) খন্ড ঃ ১ম, পৃষ্ঠ ঃ ৪৪৭
*৩. ফাতওয়া দারুল উলুম (জাদীদ) খন্ড ঃ ৪র্থ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৯
* ৪. ফাতওয়া দারুল উলুম (কদীম) খন্ড ঃ ১ম, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৯

মো ঃ তাজুল ইসলাম,
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

প্রশ্ন ঃ নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাওয়া গুনাহের কাজ কিন্তু অনেক আলেমের মুখে শুনে থাকি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দূর দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়া গুনাহের কাজ নয়। এ দূরত্ব একেক জন একেকভাবে বর্ণনা করেন, তাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে সঠিক মাসআলাটি জানাবেন।

উত্তর ঃ নামাজরত ব্যক্তি যদি ছোট ঘর বা মসজিদে থাকে এবং তার সামনে কোন প্রকার ছুতরা না থাকে, তাহলে তার সামনে যতদূর দিয়েই অতিক্রম করুক গুনাহগার হবে।

মসজিদ কোনটি ছোট বা কোনটি বড় এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে শেষ ফায়সালা হলঃ যেই মসজিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত ৪০ হাতের কম তা ছোট মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে এবং ৪০ হাত বা তার চেয়ে বেশি হলে বড় মসজিদ বলা যাবে। পক্ষান্তরে যদি মসজিদ বড় বা কিংবা নামায ময়দানে পড়া হয় তাহলে নামাযরত ব্যক্তির কতটুকু দূর দিয়ে গেলে গুনাহগার হবে এ নিয়েও মতভেদ রয়েয়ে। তবে শেষ ফায়সালা হল ঃ মুসল্লী সিজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখলে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় সে পরিমান দূরত্বের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করলে গুনাহগার হবে।

*১. আদ্দুররুল মুখতা –পৃষ্ঠ ঃ ৬৩৪
* ২. কেফায়া- খন্ড ঃ ১ম, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৩
* ৩. তাহতাবী আলাদ্দুর- খন্ড ঃ ১ম, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৮
* ৪. ফাতওয়া আলমগিরী-খন্ড ঃ ১ম, পৃষ্ঠা ঃ ১০৪
* ৫. বাহরুর রায়েক- খন্ড ঃ ২য়, পৃষ্ঠা ঃ ১৫
* ৬. ফাতহুল কাদীর- খন্ড ঃ ১ম, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৩-৩৫৪
* ৭.ফাতওয়া দারুল উলুম কাদিম- খন্ড ঃ ২য়, পৃষ্ঠা ঃ ৪১২

পাঠকের অভিমত

মজলুমদের আহবানে সাড়া দাও

- শাব্বীর বিন হুসাইন

দুনিয়া ব্যাপী চলছে আজ মুসলিম নিধনযজ্ঞ চলছে আজ চতুর্দিকে নির্যাতন, নিপীড়ণ, ধর্ষন, হত্যা ও লুণ্ঠন আর এসমস্ত অসহ্য যন্ত্রনা ও নিপিড়ন মূলত মুসলমানদের উপরেই চালানো হচ্ছে। তাই যেখানে আজ অসহায় মুসলমানদের উপর চালানো হচ্ছে নির্যাতনের স্টীম-রোলার ও যেখানে আজ অসহায় মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা হচ্ছে আর মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে । তাই সেই সমস্ত মযলুম মুসলমানদের আহ্বানে সাড়া দিল যারা তারাই হলো তালেবান । তারাইতো ঐ জাতি যারা নিজের মা বোন ও নিজের সন্তান- সন্ততির মায়া মহব্বত পরিহার করে , আরাম আয়েশ আর ভোগ বিলাসের নরম পরশ ছেড়ে খুন রাঙ্গা পথ ও পাথুরী পথে পা বাড়িয়েছে তারাই সেই সিংহ পুরুষ বর্তমান যারা তালিবান নামে পরিচিত । যাদের রগহুংকারে বর্তমানের এটম শক্তিধর বুশ, ব্লেয়ারের ঘুম ভেঙ্গে যায় । এবং যাদের জানবাজি যুদ্ধ দেখে কাফির সেনাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় । তারাই হলো এমাত্র আল্লাহ ও তার রাসুলের সৈনিক তালিবান। আজ তাদের এ জিহাদি মিশন পৃথিবী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তারা চায় আল্লাহর এই যমিনে শুধু আল্লাহর হুকুম চলবে, অন্য কোন হুকুমমই চলবেনা কারন এই যমিন আল্লাহরই তাই এ যমিনে আল্লহর হুকুমই চলবে । আর এই সমস্ত আল্লাহ সৈনিকদের নেই কোন রাজা বাদশাহ হওয়ার লোভ লালসা, নেই কোন প্রজা হওয়ার লোভ লালসা । যদি রাজা বাদশাহ আর প্রজা হওয়ার লোভ লালসা তাদের অন্তরে থাকতো তাহলে তারা নিজের দেশেই পারত। কেন অযথা আফগান ,কাশ্মীর, চেচনিয়ার রণপ্রান্তরে নিজের প্রাণ বিসর্জন করা! তাই এতেই প্রমাণিত হয যে, তাদের অন্তরে একটি ব্যথা অনুভব হচ্ছিল যেটি তাদেরকে নির্যাতিত মা-বোনদের পাশে দাঁড়াতে বাধ্য করল। কারণ তারা যখন বিভিন্ন দেশের নির্যাতিত মুসলমানদের আর্তচিৎকার শুনতে পায় তখন তাদের নিশ্চুপে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর এতেই তারা হাতে তুলে নিত অস্ত্র। আর পাড়ি জমাতো আফগান, কাশ্মীর, চেচনিয়া, আরাকান রণপ্রান্তরে। নির্যাতিত মুসলমানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে।

কুফরী আগ্রাসনকে রুখে দিতে। আর সেথায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শাসন জারি করে মুসলমানদের একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিতে। তাদের এতটুকুই আশা যে, আমাদের জাতিরা সুখ-শান্তিতে বসবাস করুক। আর কুরআন হাদীস অনুযায়ী জীবন গড়ুক। তাই আজকের বর্তমানে যখন, আল্লাহ ও তার রাসূল সৈনিকদের বিশ্বব্যাপী চলছে পুনর্জাগরণ। আর যখনই দিকে দিকে হচ্ছে ইসলামী শরীয়ত ও কুরআনের হুকমত কায়েম, তখনই নমরূদ, ফেরআউনের উত্তরসূরী বুশ, ব্লেয়ার ও তাদের অনুসারীদের ঘুম হারাম হয়ে যায় আর তখনই ফেরআউনের নব্য দলেরা মুসলমানদের উৎখাত করার জন্য সর্ব প্রকারের মরণাস্ত্র নিয়ে একের পর এক মুসলিম দেশগুলোকে বিভিন্ন অজুহাতে শেষ করে দিচ্ছে। সেই ধবংসের হাত থেকে মুসলমানদের পবিত্র ভূমিগুলিও রক্ষা পাচ্ছেনা । যার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্বব্যাপি কুফুরী আগ্রাসনকে নস্যাৎ করে দেওয়ার আহব্বান জানাচ্ছে। তালেবান এমনই একটি যোদ্ধাজাতি যাদের পরশে নেই কোন নিন্দা। তাই বিবেকবান সমাজ এর বুদ্ধিজীবীদের কাছে থাকবে আমার আকুল আবেদন যে, বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজকে বাঁচানোর জন্য তালিবানদের আহব্বানে সাড়া দিয়ে নিজের ঈমানকে হিফাজত করুন।আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বিশ্বব্যাপি মজলুমদের সহোযোগিতা করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

হৃদয়-বাতায়নে তুমি স্নিগ্ধ সমীরণ

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাহেব,

আসসালামুআলাইকুম। আপনার প্রকাশিত 'আত্-তাহ্রীয' পড়লাম। জীবনের বেলাশেষে মুসলিম উম্মাহর শেষ স্মৃতিচিহ্ন টুকু মুছে দিতে যখন মানুষরুপী হায়েনার দল শত ব্যস্ত ঠিক এমনি সময় স্নিগ্ধ আলোর ঝলকানী নিয়ে আবির্ভাব ঘটল "মাসিক আত্-তাহ্রীয" এর। সত্যিই অত্যন্ত যুগোপযোগী ও সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এ পত্রিকাটির প্রকাশ। তাই আত্-তাহ্রীযকে উদ্দেশ্য করে দু'চার লাইন না লিখে পারলাম না।

সেদিন তেশরা মে ফজরের নামাজ পড়ে ভাল লাগছিলনা। মনটা খুব খারাপ। তারপর শুয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। বেলা ৮/৯ টার দিকে উঠে; গেলাম পাশের লাইব্রেরীতে। মাসিক ইসলামী পত্রিকাগুলো এসেছে কি-না দেখতে, দেখলাম এসেছে । কিনলাম দু'টি পত্রিকা। তারপর বেশ আনমনা হয়ে দোকানের অন্যান্য পত্রিকা গুলো দেখছিলাম উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে। হঠাৎ চোখে পড়ে নীল কভারের উপর "মদীনা মুনওয়ারার" ছবি সম্বলিত একটি পত্রিকা। নাম "আত্-তাহ্রীয।" তারপর পত্রিকাটির উপর বেশ কিছু সময় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। মনেহলো কতদিনেরই না পরিচিত। সে আমায় যেন বলছে "নেবেনা

আমায়"! অবশেষে মন বিচারকের কাছে কেনার অনুমতি পেলাম। কিনলাম দশ টাকা দিয়ে। তারপর রুমে এসে পড়লাম বেশ ক'বার। বিশেষ করে পড়লাম আল মুফাক্কির এর " প্রতীক্ষার শেষ প্রহর"। বেশ ভাল লাগল। ইসলামের মহান পুরুষ হযরত জা'ফর তাইয়্যার (রাঃ) এর প্রতি আপন হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত ভালবাসাটুকু পরম শ্রদ্ধায় ক'ফোটা অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়লো নয়নযুগল হতে একান্ত নীরবে। সত্যিই মানুষরূপী হায়েনা বুশ-ব্লেয়ারের যুগে হযরত জা'ফর তায়্যার (রাঃ) এর মতো বীরদের আজ বড় প্রয়োজন। কিন্তু আর কতদিন? 'আত্-তাহ্রীয' তোমাকে বলছি " তুমি তোমার সাদা বুকের পবিত্র লেখনী দিয়ে আজ আমাদের জাগ্রত কর। আলোর দীপ্ত মশাল জ্বালিয়ে আমাদের সেই পথ দেখাও যেখানে রয়েছে ভোরের স্নিগ্ধ শিশির আর শৈল চুঁড়ার বরফের ন্যায় পুত-পবিত্র শুভ্র চির-সবুজ, চির-সুন্দর ইসলাম।

" There is a garden in her face
Where the roses and white lilies grow"

" আত্-তাহ্রীয" শুধু প্রাকৃতিক লু-হাওয়া নয় ,জাঁকালো পাপ আর অমানবিক লোলুপতার অত্যুষ্ণ লু -হাওয়ায় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব যখন নির্মমভাবে দগ্ধ ঠিক তখনই মুক্তি প্রত্যাশী এ তৃষিত বিশ্বে স্বীয় অস্তিত্বের দুঃসাহসিক আবির্ভাব ঘটালে তুমি নিঃগৃহীত মানবাত্মার স্বাধীনতার সনদ রুপে। সত্যিই কালজয়ী তোমার আত্মার প্রকৃতিগত মানুসিকতা সর্বকালের হীন মানবীয়তাকে জনমের মতো পরাজিত করে যুগ-যুগান্তরের মানব মনে চিরবিস্ময় হয়ে বিচরণ করবে–ইনশাআল্লাহ্। তোমার প্রত্যেকটি প্রকাশ অনাগত দিনের আগন্তুকদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাক। প্রতিটি দিনের প্রতিটি ক্ষণে হৃদয়ের বাতায়নে তুমি স্নিগ্ধ সমীরণ হয়ে বয়ে যেও। এই শুভ কামনায়। ইতি–

কে. এম. আসাদ-উজ-জামান।
আমিনবাজার, ঢাকা।

আত-তাহ্রীযকে জানাই সাদর অভিনন্দন

মুহতারাম সম্পদক সাহেব!

আমি আত্-তাহ্রীযের প্রথম সংখ্যাটি পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আন্দোলিত হয়েছে ধূসর চিত্ত। উচ্ছাসিত হয়েছে আমার ঘনিষ্ট বান্ধবীরাও। তাদেরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পেরে কিছুটা গর্বিত আমি। কারণ তারা ইসলামী বই,পুস্তক ছুঁতেও ছিল নারাজ। ওদের যত সাধ আহলাদ অশালীন উপন্যাস, ম্যাগাজিনে। তারা হুমায়ুন আহমাদ ই,হক মিলন, রবী ঠাকুর প্রমুখদের বইয়ের ভক্ত। কিন্ত আত্-তাহ্রীয পাঠ করার পর তাদের অনুভুতির পরিবর্তন হয়েছে । তাদের ধারণা ছিল ইসলামী বই, পত্র - পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে শুধু ধর্মীয় কথা থাকে কোন সাহিত্য বা আনন্দ পাওয়া যায়না ওসবে। কিন্ত আত্-তাহ্রীয পাঠ করার পর তাদের সে ধারণা ভেঙ্গে গেছে। তাই আমরা সকল বান্ধবী প্রতিজ্ঞা করেছি প্রতি মাসেই আত্ তাহ্রীযের সংখ্যাটি পড়ব ইনশাআল্লাহ। এ পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। ইতি

শারমীন ওয়াহিত (রাণী)
সাভার, ঢাকা

অফুরন্ত ভালবাসা রইল তোমার প্রতি

শুরুতেই আত্-তাহ্রীয পরিবার ও সকল পাঠক-পাঠিকাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, সাথে সাথে " পূণ্য জীবনে ধন্য যে জন" বিভাগে "প্রতিক্ষার শেষ প্রহর" এর লেখক আল-মুফাককির সাহেবর প্রতি রইল পরম শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত ভালবাসা। আমার জানা ছিলনা, কোন সাহাবা -চরিত এভাবে প্রানবন্ত করে সাহিত্যে ফুটানো যায়। লেখকের শব্দ চয়ন ও বর্ণনা শৈলী সত্যি চমৎকার। নোংরা ও অশালীন সাহিত্যের ভীড়ে এধরণের পরিমার্জিত,রুচিশীল সাহিত্য নির্মাণ প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। আমি আশাবাদী, আত্-তাহ্রীয সাহিত্য জগতকে দাদুবাবু ও নাস্তিকতার পরিমন্ডল থেকে বের করে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে । তাই আমি সংশ্লিষ্ট লেখক ও সম্পাদক মন্ডলীর কাছে আশাকরি যে, এ ধরনের লেখা অধিক পরিমানে উপহার দিয়ে তারা পত্রিকাটির সবশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য উপভোগ্য ও শিক্ষণীয় করে তুলবেন।

ইতি এম.রইস
কাওরান বাজার,ঢাকা।

চিরজীবী হোক তোমার পথচলা।

শুরুতেই জানাই আত্-তাহ্রীয পরিবারকে আমার গভীর ভালবাসা সেই সাথে তার সকল পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি একরাশ শুভেচ্ছা। পত্রিকাটি পড়ে সত্যিই আনন্দিত না হয়ে পারলামনা। কারণ আজ সমগ্র পৃথিবী ছেয়ে গেছে অন্ধকারে, গোটা মুসলিমজাতি অশান্তির অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। বিশ্ব-মুসলিমজাতি আজ অন্যায়, অবিচার,জুলুম ও নির্যাতনের হিংস্র থাবায় জর্জরিত। চতুর্দিকে অপসংস্কৃতিতে ছেয়ে গেছে ঠিক এমুহূর্তে নব্যজাহিলিয়াতের নিকষ-কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত, হাজার বিকৃত, অশ্লীল ম্যাগাজিনের প্রভাবে যুব সমাজ যখন পথভ্রষ্ঠ ঠিক তখনই সমাজের মানুষকে সত্যের সন্ধান দিতে এগিয়ে এলো মাসিক আত্-তাহ্রীয। আত্-তাহ্রীয হোক যুব সমাজের আনন্দ বিনোদনের অবলম্বন। গভীর অন্ধকারে পথহারা পথিকের প্রত্যশিত ধ্রবতারা। আত্-তাহ্রীয চিরজীবী হোক তোমার পথচলা। ইতি

হাফেজ মোজাম্মেল হক হেলালী
দারুল উলুম কাতিয়া মাদ্রাসা
সুনামগঞ্জ

সম্মানিত পাঠক/পাঠিকা,

আস্‌সালামু আলাইকুম, আত্-তাহ্‌রীয এর পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক সালাম ও অভিনন্দন। বহু প্রতীক্ষিত পত্রিকা আত্-তাহ্‌রীয এর প্রথম সংখ্যা আপনাদের হাতে পৌছার পর অনেক গ্রাহক/পাঠক/পাঠিকা তাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছেন এ জন্য তাদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। অনেকে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠিয়েছেন, যাদের লেখা আমা-দের হাতে যথাসময়ে পৌছেছে তাদের লেখা ছাপানো হলো আর যাদের লেখা পত্রিকায় আসেনি তাদের মন খারাপের কিছু নেই। আবারও লিখুন ধৈর্য্য হারাবেন না।

আর হ্যাঁ একটি কথা না বললেই নয়, লেখা কিন্তু অবশ্যই ইংরেজী মাসের ১২ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে। সেই সাথে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখবেন লেখা সুন্দর,স্পষ্ট এবং পৃষ্টার এক পাশে লিখবেন। এক পৃষ্টার উপযোগী লেখার জন্য অনূর্ধ ৭০০ শব্দের মধ্যে আপনার লেখা শেষ করবেন।

- সম্পাদক

মাসিক **আত-তাহ্‌রীয** এর নিয়মাবলী

এজেন্সী

- সর্বনিম্ন দশ কপির এজেন্সী দেয়া হয়
- এজেন্সীর জন্য অগ্রিম বা জামানত পাঠাতে হয় না
- পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হয়
- যে কোন মাস থেকে এজেন্সী দেয়া হয়
- যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়
- অবিক্রিত কপি ফেরৎ নেয়া হয় না
- প্রতি বিশ কপিতে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

- বাংলাদেশ। ● রেজিষ্ট্রি ডাক দুইশত টাকা ● সাধারণ ডাক একশত পঁয়তাল্লিশ টাকা
- ভারত, নেপাল, পাকিস্তান। দশ ডলার ● মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া। ষোল ডলার
- ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া। বিশ ডলার

গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নিয়ম

গ্রাহক হবার জন্য দেশের অভ্যন্তর থেকে মণিঅর্ডার পাঠাতে হবে নিম্নের ঠিকানায়-

বিজ্ঞাপনের হার

চতুর্থ কভার (পূর্ণপৃষ্ঠা)	৮,০০০/-
দ্বিতীয় ও তৃতীয় কভার (পূর্ণপৃষ্ঠা)....	৬,০০০/-
ভিতরের পূর্ণপৃষ্ঠা	৪,০০০/-
ভিতরের অর্ধপৃষ্ঠা	২,৫০০/-
ভিতরের এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	১,৬০০/-

পত্র যোগাযোগের ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক
মাসিক আত-তাহ্‌রীয
শাহীন সুপার মার্কেট,
আমিন বাজার, সাভার,ঢাকা

আত্-তাহ্রীয পাবলিকেশন্স

এখানে কওমী নেসাবের সকল প্রকার কিতাব
ও নির্ভরযোগ্য ইসলামী বই, ক্যাসেট, টুপি,
আতর, পাঞ্জাবীর কাটপিছ পাওয়া যায়।

প্রকাশিত ঃ ক্যাসেটসমূহ

- দূর্জয় কাফেলা
- নির্ভীক কাফেলা
- বিপ্লবী জাগরণ
- আজাদীর খুন

(ইসলামী রনাঙ্গণ শিল্পীগোষ্ঠী)

শিঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে (বই)

- কোরাআন সুন্নাহর কষ্টি পাথরে এলমে গায়েব ও হাযির-নাযির
- জাগো নওজোয়ান
- জিহাদের চল্লিশ হাদীস
- খুন তরঙ্গ (কাব্যগ্রন্থ)
- অপারেশনে তুরিকানাভা (সিরিজ-১)

পাইকারদের জন্য বিশেষ কমিশন এবং ভি পি যোগে বই পাঠানোর ব্যবস্থা আছে

আত্-তাহ্রীয পাবলিকেশন্স

১২/ডি ব্লক, মুসলিম বাজার, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মসজিদ
উত্তর গেইট, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

নির্বাহী সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও দি দেশ প্রিন্টার্স, ১০ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা-১১০০ হতে মুদ্রিত।